আত্ম-সাক্ষাৎকার

লাভ করার সরল আর নির্ভুল বিজ্ঞান

জ্ঞানী পুরুষ দাদাশ্রী (দাদা ভগবান)

জ্ঞানী পুরুষ 'দাদা ভগবান' এর দিব্য জ্ঞানবাণী

সংকলন ঃ পূজ্যশ্রী দীপকভাই দেসাই

আত্ম-সাক্ষাৎকার
লাভ করার সরল আর নির্ভুল বিজ্ঞান

প্রকাশক ঃ অজীত সি. প্যাটেল, মহাবিদেহ ফাউন্ডেশন, ৫ মমতাপার্ক সোসাইটি, উসমানপুরা, আহমদাবাদ-৩৮০০১৮। ফোন নং (০৭৯) ২৭৫৪০৪০৮

ভাবমূল্য ঃ 'পরম বিনয়' আর 'আমি কিছু জানি না' এই ভাব।

মুদ্রক ঃ অম্বা অফসেট, মহাবিদেহ ফাউন্ডেশন, পার্শ্বনাথ চেম্বার্স, উসমানপুরা, আহমদাবাদ।

দাদা ভগবান কে?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬'টার সময় ভীড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৩-এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহমন্দিরে অলৌকিকভাবে, অক্রমরূপে, বহুজন্ম ধরে ব্যক্ত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল 'দাদা ভগবান' পূর্ণরূপে প্রকট হলেনঅধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রকট হল। অলৌকিভাবে এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল। 'আমি কে? ভগবান কে? জগত কে চালায়? কর্ম কি? মুক্তি কি?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমস্ত রহস্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হল। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ দর্শন প্রদান করল যার মাধ্যম হলেন গুজরাত-এর ভাদরন গ্রামনিবাসী পাটীদার শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেল যিনি কন্ট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী ছিলেন।

'ব্যবসা-তে ধর্ম জরুরি কিন্তু ধর্ম-তে ব্যবসা নয়' এই নীতি অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারোর কাছ থেকে অর্থ নেন নি, উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদের তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার অদ্ভূত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা ওনার যে রকম প্রাপ্তি হয়েছিল তেমনই অন্য মুমুক্ষুদের-ও তিনি কেবল দু'ঘন্টাতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন। একে অক্রম মার্গ বলে। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের আর ক্রম মানে সিঁড়ির পরে সিঁড়ি - ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফট্-মার্গ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা।

উনি স্বয়ংই 'দাদা ভগবান'কে? এই রহস্য জানাতেন। উনি বলতেন 'যাকে আপনারা দেখছেন তিনি দাদা ভগবান নন। তিনি তো এ.এম.প্যাটেল; আমি জ্ঞানী পুরুষ আর আমার ভিতর যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। 'দাদা ভগবান' তো চৌদ্দ লোকের নাথ, উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যেই আছেন; আপনার মধ্যে অব্যক্তরূপে আছেন, আর আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত অবস্থায় আছেন।' 'দাদা ভগবান'কে আমিও নমস্কার করি।'

আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করার সরল আর নির্ভুল বিজ্ঞান

১, মনুষ্য জীবনের ধ্যেয় কি?

কেন বেঁচে আছি-তাই জানি না; এই পুরো জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে গেছে। লক্ষ্য (ধ্যেয়) ছাড়া জীবনের কোন অর্থ নেই। টাকা-পয়সা আসে আর খাওয়া-দাওয়া করে, মজা করে সারাদিন চিন্তা আর অশান্তির মধ্যে কাটানোকে কেমন করে জীবনের লক্ষ্য বলা যেতে পারে?

মনুষ্যজীবন এইভাবে ব্যর্থ করার কোন অর্থ নেই। মনুষ্যজীবন লাভ করার পর সেই জীবনের লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে কি করা উচিত? সাংসারিক সুখ, ভৌতিক সুখের লক্ষ্য হলে নিজের যা কিছু আছে তা সবার সাথে ভাগ করে নাও।

এই জগতের নিয়ম একটা বাক্যেই বলা যায়; এই জগতের সমস্ত ধর্মের মূল কথা, সার কথা এটা-ই, 'যদি মানুষ সুখ চায় তো অন্যকে সুখ দিতে হবে আর দুঃখ চাইলে দুঃখ দিতে হবে।' তোমার যা চাই সেরকমই দেবে। কেউ বলতে পারে যে আমার তো টাকা-পয়সা নেই, আমি কি করে অন্যকে সুখ দেব! কিন্তু এমন নয় যে টাকা-পয়সা না থাকলে অন্যকে সুখ দেওয়া যায় না। বিপদের সময় বা দরকারে শারীরিক ও মানসিকভাবে লোকের পাশে দাঁড়ানো, কাউকে সঙ্গ দেওয়া, কারোর প্রয়োজনে তার কাজ করে দেওয়া, জিনিষপত্র এনে দেওয়া, কোন পরামর্শ দরকার থাকলে দেওয়া - এভাবেও লোকের উপকার করা যায়।

ধ্যেয় দুই প্রকারের - সাংসারিক এবং আত্যন্তিক

সাংসারিক লক্ষ্য পূরণের জন্যে এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে জীবনযাপন এমনভাবে করতে হবে যাতে কারোর কোন দুঃখের কারণ না হই, কোন জীব যেন বিন্দুমাত্রও দুঃখ না পায়। এরকম লক্ষ্যই সংসারে থাকা উচিৎ যে কেবলমাত্র সৎ, ধার্মিক লোকের সঙ্গই জীবনে হয়, কোনপ্রকার কুসঙ্গ না হয়। দ্বিতীয়প্রকারের ধ্যেয়তে যদি কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানী-পুরুষের সাক্ষাৎ হয়, তাহলে তাঁর থেকে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করে তাঁর সৎসঙ্গেই থাকলে জীবনের সমস্ত কার্যসিদ্ধি হয়; সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে মোক্ষলাভ হয়।

মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ 'মোক্ষ' প্রাপ্ত করা; আপনাকেও তো মোক্ষ পেতে হবে? অনন্ত জন্ম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর কতদিন এভাবে ঘুরবেন? কেন এরকম জন্ম-জন্মান্তর ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে? কারণ 'আমি কে' এটাই জানতে পারেন নি। নিজের স্বরূপকে জানা হয় নি। শুধু অর্থ রোজগারে জীবন অতিবাহিত না করে নিজের স্বরূপকেও জানার চেষ্টা করা উচিৎ, মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিৎ - নয় কি? মানুষ স্বয়ংই পরমাত্মা হতে পারে। নিজের সেই পরমাত্মা-স্বরূপকে প্রাপ্ত করা - এই হল মানুষের জীবনের অন্তিম ধ্যেয়।

মোক্ষ, দুটি পর্যায়ে

প্রশ্নকর্তা ঃ মোক্ষ - এর অর্থ আমরা সাধারনভাবে বুঝি যে জন্ম - মরন থেকে মুক্তি।

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক কিন্তু সেটা অন্তিম মুক্তি, দ্বিতীয় পর্যায়ে হয়। প্রথম পর্যায়ের মুক্তি হল সাংসারিক দুঃখের অভাব। সংসারে থেকেও যদি দুঃখ স্পর্শ না করে, সমস্ত বিঘ্ন-বিপদেও যদি সমাধিদশা থাকে তা হল প্রথম পর্যায়ের মোক্ষ। পরে যখন দেহত্যাগ হয় তখন আত্যন্তিক মোক্ষ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের মোক্ষ হয়। প্রথম পর্যায়ের মোক্ষ এখানেই হওয়া উচিৎ। আমার মোক্ষ তো হয়ে গেছে। সংসারে থেকেও সংসার স্পর্শ না করে এরকম মোক্ষ হওয়া চাই। এই অক্রম-বিজ্ঞান দ্বারা এরকম মোক্ষ হওয়া সম্ভব।

২. আত্মজ্ঞান থেকে শাশ্বত সুখ প্রাপ্তি

জীবমাত্রই কি চায়? আনন্দ চায় কিন্তু অল্প কিছু সময়ের জন্যেও আনন্দ পায় না। বিবাহ-অনুষ্ঠান বা নাটক যেখানেই যাওয়া যাক না কেন পরে আবার সেই দুঃখই ফিরে আসে। যে সুখের পরে দুঃখ আসে তাকে সুখ বলা যায় কি করে? ওটা তো ক্ষণিক সুখ - মূর্চ্ছিতের আনন্দ। এই সমস্ত সুখ ক্ষণস্থায়ী, কল্পিত সুখ। আসল তো চিরস্থায়ী। প্রত্যেক আত্মা কি খুঁজছে? চিরস্থায়ী সুখ, শাশ্বত সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই সুখ এখান থেকেই পাওয়া সম্ভব। এই জিনিসটা পেলে, বাড়ি বানালে, গাড়ি কিনলে সুখ পাওয়া যাবে এই ভেবেই মানুষ ঘুরে মরছে কিন্তু কিছুই এর থেকে পায় না। উল্টে আরও বেশী করে সংসারের জালে জড়িয়ে পড়ে। সুখ তো নিজের ভিতরেই আছে,

আত্মাতেই আছে। সুতরাং আত্মা প্রাপ্তি হলেই সনাতন সুখ লাভ হবে।

সুখ আর দুঃখ

জগতে সবাই সুখেরই খোঁজ করছে কিন্তু সুখের পরিভাষা জানা নেই। সুখ তো এমন হওয়া উচিৎ যার পরে আর দুঃখ কখনও না আসে। এরকম কোন সুখ যদি এই জগতে থাকে তাহলে তা খুঁজে বার করো। শাশ্বত সুখ তো নিজের ভিতরেই আছে; নিজেই অনন্ত সুখের ধাম অথচ লোকেরা নশ্বর পদার্থের মধ্যে সুখ খুঁজে ফেরে।

সনাতন সুখের খোঁজ

যে সনাতন সুখ পেয়েছে তাকে যদি সংসারের সুখ স্পর্শ না করে তো সেই আত্মা মুক্তি পেয়েছে। সনাতন সুখই মোক্ষ। আর অন্য মোক্ষের কি প্রয়োজন! আমার সুখ চাই। আপনার সুখ ভাল লাগে কি না তা আমাকে বলুন।

প্রশ্নকর্তা ঃ ওর জন্যই তো সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, কিন্তু অস্থায়ী সুখ চাই না। তা ভাল লাগে না। অস্থায়ী সুখের পরে দুঃখ আসে সেইজন্যেই তা ভাল লাগে না। সনাতন সুখের পরে আর দুঃখ আসে না। যদি এরকম সুখ পাওয়া যায় তো সেটাই মোক্ষ।

মোক্ষের অর্থ কি? সংসারী দুঃখের অভাবই মোক্ষ। এ সংসারে দুঃখের অভাব কারোর নেই! এই জগতের বিজ্ঞানীরা তো বাইরের বিজ্ঞানের চর্চা করছে; আর একে অন্তরবিজ্ঞান বলে - যা নিজেকে সনাতন সুখের প্রতি অগ্রসর করে। অতএব যা সনাতন সুখের প্রাপ্তি করায় তাকে আত্মবিজ্ঞান বলে আর যা সাংসারিক বিনাশী সুখের সন্ধান দেয় তাকে ভৌতিকবিজ্ঞান বলে। ভৌতিকবিজ্ঞান তো নিজেও বিনাশী আর বিনাশ করায় কিন্তু অক্রমবিজ্ঞান সনাতন আর সনাতনই করায়।

৩। 'আমি' এবং 'আমার', এ দুটি ভিন্ন

জ্ঞানীই স্পষ্টভাবে এর মৌলিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন

'আমি' হল ভগবান আর 'আমার' হল মায়া। 'আমি'-ই সত্য। 'আমার'-এটা আপেক্ষিক। আত্মার গুণকে 'আমি'তে আরোপিত করলে আপনার শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। মূল আত্মা জ্ঞানীর সহায়তা ছাড়া লাভ করা যায় না।

কিন্তু এই 'আমি' এবং 'আমার' যে ভিন্ন এই কথাটা যদি সবাই, এমনকি বিদেশীরাও বুঝতে পারে তাহলে তাদের অশান্তি অনেক কম হয়ে যায়। এটা বিজ্ঞান। অক্রম বিজ্ঞানের এই আধ্যাত্মিক গবেষণা একেবারেই নতুন। 'আমি'-এটা 'স্ব'ভাব আর 'আমার'-এটা স্বামীত্ব-ভাব।

'আমি' এবং 'আমার' পৃথক করতে হবে কি না?

আপনাকে যদি বলা হয় যে কোন পদ্ধতির দ্বারা 'আমি' এবং 'আমার' পৃথক করুন তাহলে কি আপনি তা পারবেন? 'আমি' এবং 'আমার' পৃথক করা কিভাবে সম্ভব তা জানতে হবে। যেমন দুধ থেকে মালাই আলাদা করা হয় তেমনি এই বিজ্ঞানও 'আমি' এবং 'আমার'-কে আলাদা করে। আপনার কাছে 'আমার' বলে কি জিনিস আছে? 'আমি' একাই আছে না সাথে 'আমার' ও আছে?

প্রশ্নকর্তা ঃ 'আমার' তো সাথেই আছে।

দাদাশ্রী ঃ আপনার কি কি জিনিস আছে যা 'আমার' মধ্যে পড়ে?

প্রশ্নকর্তা ঃ আমার বাড়ী আর বাড়ির সমস্ত জিনিস।

দাদাশ্রী ঃ সব-ই আপনার? আর স্ত্রী কার?

প্রশ্নকর্তা ঃ আমারই।

দাদাশ্রী ঃ আর বাচ্চারা কার?

প্রশ্নকর্তা ঃ ওরাও আমার।

দাদাশ্রী ঃ আর এই ঘড়ি কার?

প্রশ্নকর্তা ঃ ওটাও আমার।

দাদাশ্রী ঃ আর এই হাত কার?

প্রশ্নকর্তা ঃ হাতও আমারই।

দাদাশ্রী ঃ তবে 'আমার মাথা, আমার শরীর, আমার পা, আমার কান, আমার চোখ' এইরকম বলবেন। এই শরীরের সমস্ত বস্তুকে আমার বলছেন তো 'আমার' যিনি বলছেন 'তিনি' কে? এটা কখনও ভাবেন নি? 'আমার নাম চন্দুভাই' এরকম বলবেন আবার যদি এরকম বলেন যে 'আমিই চন্দুভাই' তো এই দুটি বাক্যের মধ্যে কোন বিরোধাভাস লাগছে না কি?

প্রশ্নকর্তা ঃ লাগছে।

দাদাশ্রী ঃ আপনি 'চন্দুভাই' কিন্তু এতে 'আমি' এবং 'আমার' দুটো জিনিস আছে। এই 'আমি' এবং 'আমার' পাশাপাশি চলা দুটো রেলের লাইনের মতই আলাদা; সমান্তরাল থাকে কখনও মিশে যায় না। তবুও আপনি এদের এক মনে করেন, এটা বুঝে নিয়ে 'আমার'কে আলাদা করে দিন। আপনার মধ্যে যা যা 'আমার' আছে তাতে একদিকে রাখুন। 'আমার' হৃদয় তো তাকে একদিকে রাখুন। এই শরীর থেকে আর কি কি আলাদা করতে হবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ পা, ইন্দ্রিয়সমূহ।

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, সবকিছুই। মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার সবই। আর 'আমার অহংকার' বলেন না 'আমি অহংকার' বলেন?

প্রশ্নকর্তা ঃ আমার অহংকার।

দাদাশ্রী ঃ আমার অহংকার বললে সেটা পৃথক করতে পারবেন। কিন্তু তারপরে যা আছে তাতে আপনার অংশ কতটা তা আপনি জানেন না। সেইজন্যে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয় না। আপনি নিজে কিছুদূর পর্য্যন্তই জানতে পারবেন। আপনি স্থূলবস্তুকেই শুধু জানেন, সূক্ষ্মকে জানেন না। সূক্ষ্মকে পৃথক করা, তারপরে সূক্ষ্মতরকে পৃথক করা, তারপরে সূক্ষ্মতমকে পৃথক করা - এ তো জ্ঞানীপুরুষেরই কাজ।

কিন্তু এক এক করে সমস্ত অংশ যদি পৃথক করতে থাকেন তো 'আমি' আর 'আমার' এই দুটো পৃথক করা যায় না কি? 'আমি' আর 'আমার' এই দুটো পৃথক করতে করতে শেষে কি থাকবে? সমস্ত 'আমার'কে যদি একদিকে রাখেন তাহলে কি বাকি থাকল?

প্রশ্নকর্তা ঃ 'আমি'।

দাদাশ্রী ঃ ওই 'আমি'ই আপনি স্বয়ং। ওই 'আমি'কেই অনুভব করতে হবে। এইখানেই আমাকে দরকার হবে। আমি আপনার মধ্যে ওই সমস্ত কিছু আলাদা করে দেব। তারপরে আপনার 'আমি শুদ্ধাত্মা', এই অনুভব থাকবে। এই অনুভবের সাথে দিব্যচক্ষুও প্রদান করব। যাতে 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' (সর্বজীবে আত্মা বিরাজমান) দেখতে পান।

৪. 'আমি'-কে কি করে জানা যাবে

জপ - তপ, ব্রত আর নিয়ম

প্রশ্নকর্তা ঃ জপ, তপ, নিয়ম এসবের কি প্রয়োজন আছে?

দাদাশ্রী ঃ এটা এরকমভাবে বলা যায় যে ওষুধের দোকানে যত ওষুধ আছে সবই তো প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিভিন্ন লোকের প্রয়োজন বিভিন্ন। আপনার যতটুকু ওষুধ দরকার ততটুকুই তো আপনাকে নিতে হবে।

তেমনি ব্রত, তপ, নিয়ম এসবেরও প্রয়োজন আছে। এ জগতে কিছুই ভুল নয়। জপ-তপ কিছুই ভুল নয়। কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ এবং মান্যতা থেকে তা সত্যি।

প্রশ্নকর্তা ঃ তপ আর ক্রিয়া করে মুক্তি পাওয়া যায় কি?

দাদাশ্রী ঃ তপ আর ক্রিয়া করে ফল পাওয়া যায়, মুক্তি নয়। নীমের বীজ পুঁতলে কটু ফল পাবে আর আমের বীজ থেকে মিষ্টি ফল পাবে। তোমার যেমন ফল চাই তেমন বীজ বুনবে। মোক্ষপ্রাপ্তির তপ তো অন্যরকম, অন্তর্তপ। কিন্তু লোকে বহির্তপকেই তপ বলে মনে করে। যে তপ বাইরে দেখা যায় তা মোক্ষলাভ-এর জন্য অচল। এই তপের ফল পূণ্যলাভ হয়। মোক্ষ-এর জন্য চাই অন্তর্তপ, অদীঠ তপ (যা বাইরে দেখা বা বোঝা যায় না)।

প্রশ্নকর্তা ঃ মন্ত্রজপ করলে মোক্ষলাভ হয় না জ্ঞানমার্গ থেকে মোক্ষলাভ হয়?

দাদাশ্রী ঃ মন্ত্রজপ আপনাকে সংসারে শান্তি দেবে। মনকে যা শান্ত করে তাই মন্ত্র। এতে ভৌতিক সুখ লাভ হয়। আর মোক্ষলাভ তো জ্ঞানমার্গ ছাড়া সম্ভব নয়। অজ্ঞান থেকে হয় বন্ধন আর জ্ঞান থেকে হয় মুক্তি। এই জগতে যে জ্ঞান আছে তা ইন্দ্রিয়জ্ঞান; এটা ভ্রান্তি। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানই হল আসল জ্ঞান।

যার নিজের স্বরূপকে চিনে মোক্ষে যেতে হবে তার কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। যার ভৌতিক সুখ আবশ্যক তারই ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। মোক্ষে যেতে হলে প্রয়োজন মাত্র দুটো জিনিষ, শুধু জ্ঞান আর জ্ঞানীর আজ্ঞা।

জ্ঞানী-ই 'আমি'র পরিচয় করায়

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি বললেন যে নিজেকে জানো; তো নিজেকে জানার জন্যে কি করতে হবে?

দাদাশ্রী ঃ আমার কাছে এসে বলো যে আমার স্বরূপকে জানতে চাই। আমি তার পরিচয় করিয়ে দেব।

প্রশ্নকর্তা ঃ 'আমি কে' তা জানা কি সংসারে থেকে সম্ভব?

রিয়েল-এর জন্য জ্ঞানী।

প্রশ্নকর্তা ঃ এইরকম প্রচলিত আছে যে গুরু বিনা জ্ঞান কিভাবে সম্ভব?

দাদাশ্রী ঃ গুরু তো রাস্তা দেখান, মার্গদর্শন দেন আর 'জ্ঞানীপুরুষ' জ্ঞান দেন। 'জ্ঞানীপুরুষ' অর্থাৎ যাঁর আর জানার কিছু বাকি নেই - নিজে নিজের স্ব-স্বরূপেই অবস্থিত। 'জ্ঞানীপুরুষ' আপনাকে সব কিছু দিয়ে দেন। গুরু আপনাকে সংসারে পথ দেখান; ওনার কথা অনুসারে চললে সংসারে সুখী হবেন। কিন্তু আধি-ব্যাধি-উপাধিতে যিনি সমাধি প্রদান করেন তিনি 'জ্ঞানীপুরুষ'।

প্রশ্নকর্তা ঃ যাঁর আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে এরকম গুরুর কাছ থেকেই তো জ্ঞান পাওয়া যায়?

দাদাশ্রী ঃ শুধু আত্মসাক্ষাৎকার করলে কিছু হবে না। জ্ঞান-এর জন্যে 'জ্ঞানীপুরুষ' প্রয়োজন। যখন 'জ্ঞানীপুরুষ' স্পষ্ট করে দেন 'এই জগৎ কিভাবে চলছে, আমি কে? এ-কে?' তখনই কার্য সম্পন্ন হয়। শুধু বই পড়লেও কিছু হবে না। বই তো সাহায্যকারী, মুখ্য নয়। বই সাধারন কারন, অসাধারন নয়। অসাধারন কারন কে? - 'জ্ঞানীপুরুষ'!

অর্পণ বিধি কে করানোর যোগ্য?

প্রশ্নকর্তা ঃ জ্ঞান নেওয়ার আগে অর্পণ বিধি করানো হয়। কেউ যদি আগেই কোন গুরুর কাছে অর্পণ বিধি করে থাকে তাহলে তার কি আবার এই বিধি করা উচিৎ?

দাদাশ্রী ঃ অর্পণ বিধি তো গুরু করানই না। এখানে কি কি অর্পণ করতে হবে? আত্মা বাদে আর সব কিছু। সব কিছু অর্পণ তো কেউ করেই না। অর্পণ হয় না আর কোন গুরু এরকম করানও না। গুরু তো আপনাকে পথ দেখান। আপনার পথপ্রদর্শকের কাজ করেন। আমি গুরু নই, আমি জ্ঞানীপুরুষ। এখানে তো ভগবানকে দর্শন করতে হবে। আমাকে অর্পন করতে হবে না। ভগবানকে অর্পণ করতে হবে।

আত্মানুভূতি কিভাবে হয়?

প্রশ্নকর্তা ঃ 'আমি আত্মা'-এর জ্ঞান কিভাবে হয়? নিজে এটা কিভাবে অনুভব করা যায়?

দাদাশ্রী ঃ এটা অনুভব করানোর জন্যেই তো আমি আছি। এখানে যখন

আমি 'জ্ঞান' দিই তখন 'আত্মা' আর 'অনাত্মা'-কে আলাদা করে দিই আর আপনাকে ঘরে পাঠিয়ে দিই।

জ্ঞান-এর প্রাপ্তি নিজে থেকে হয় না। যদি নিজে থেকে জ্ঞান পাওয়া যেত তবে এই সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসী সবাই তা পেয়ে যেতেন। কিন্তু এটা জ্ঞানীপুরুষ-এর কাজ। জ্ঞানীপুরুষ-ই এর নিমিত্ত।

যেমন ওষুধের জন্যে ডাক্তারের দরকার হয়; তখন কেউ নিজে ওষুধ বানিয়ে খায় না-ভয় থাকে যে কিছু ভুল হলে মৃত্যু হবে। কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে তো নিজেই মিক্সচার বানিয়ে নাও। গুরুর দেওয়া মার্গদর্শন ছাড়াই নিজের বুদ্ধিমত শাস্ত্র পড়ে তার মিক্সচার বানিয়ে খেয়েছে! ভগবান একে স্বচ্ছন্দ বলেন। এই স্বচ্ছন্দ থেকেই তো অনন্ত জন্মের মরণ হয়েছে। যেটা একই জন্মের মৃত্যু ছিল!!!

অক্রমজ্ঞান থেকে নগদ মোক্ষ

'জ্ঞানীপুরুষ' যখন আপনার সামনে প্রত্যক্ষ আছেন তখন মার্গদর্শন হয়ে যাবে; নইলে লোক তো অনেক চিন্তা করে কিন্তু মার্গদর্শন-এর অভাবে উল্টো রাস্তায় চলে যায়। 'জ্ঞানীপুরুষ' তো কদাচিৎ একজন প্রকট হন, তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান পেলে আত্মানুভব হয়। মোক্ষ তো এখানে নগদ হতে হবে। এখানেই দেহ সমেত মোক্ষ পেতে হবে। এই অক্রমজ্ঞান থেকে নগদ মোক্ষ পাওয়া যায় আর তার অনুভব-ও হয়।

জ্ঞানীই আত্মা-অনাত্মার ভেদ করতে পারেন

এই আংটিতে সোনা আর তামার মিশ্রন আছে। যে কাউকে বললে কি সে এই সোনা আর তামা আলাদা করে দিতে পারবে? কে এই আংটি থেকে সোনা আর তামা আলাদা করতে পারবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ সোনার কারিগরই তা পারবে।

দাদাশ্রী ঃ অর্থাৎ এটা যার কাজ, যে এই কাজে পারদর্শী সেই শুধু পারবে সোনা আর তামা আলাদা করতে; কারণ সে এদের গুনধর্ম জানে। সোনার গুনধর্ম আর তামার গুনধর্ম - দুটোই তার জানা আছে। তেমনি জ্ঞানীপুরুষ আত্মার গুনধর্ম জানেন আর অনাত্মার-ও গুনধর্ম জানেন।

আংটিতে সোনা আর তামা মিক্সচার হিসাবে থাকে - তাই আলাদা করা যায়। কিন্তু সোনা আর তামা কম্পাউন্ডরূপে থাকলে তাদের আলাদা করা

যাবে না; কারণ এতে গুনধর্ম আলাদা হয়ে যায়। তেমনি জীবের ভিতরে চেতন আর অচেতন-এর মিশ্রণ আছে, যৌগ নয়। তাই নিজের স্ব-স্বভাবে ফিরে যেতে পারে। যৌগপদার্থ হয়ে গেলে চেতন-অচেতন কারোরই গুনধর্ম বর্তমান থাকত না, আর তৃতীয় এক আলাদা গুনধর্ম উৎপন্ন হত। কিন্তু সেরকম হয় নি। চেতন-অচেতন-এর কেবল মিক্সচার হয়েছে।

'জ্ঞানীপুরুষ' জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক

'জ্ঞানীপুরুষ' যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তিনিই কেবল আত্মা-অনাত্মাকে পৃথক করার পদ্ধতি জানেন এবং করতেও পারেন। উনি আত্মা-অনাত্মার বিভাজন করে দেন। শুধু তাই নয়, আপনার পাপসমূহকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেন, দিব্যচক্ষু প্রদান করেন আর এই জগত কি, কিভাবে চলছে, কে চালাচ্ছে প্রভৃতি স্পষ্ট করে দেন। তখনই আমাদের কার্য সম্পন্ন হয়।

কোটি জন্মের পুণ্যের ফলে জ্ঞানীর দর্শন হয়, নয় তো দর্শন কেমন করে হবে? 'জ্ঞান' পাওয়ার জন্য জ্ঞানী-কে চেনা জরুরী; আর অন্য কোন রাস্তা নেই। যার খোঁজ আছে সে ঠিকই পেয়ে যায়।

৬. 'জ্ঞানীপুরুষ কে?'

সন্ত আর জ্ঞানীর ব্যাখ্যা

প্রশ্নকর্তা ঃ এই যে সমস্ত সন্তপুরুষ হয়েছেন, এঁদের সাথে জ্ঞানীর পার্থক্য কোথায়?

দাদাশ্রী ঃ সন্তপুরুষ মন্দ কাজের থেকে দূরে সরিয়ে ভাল কাজের দিকে নিয়ে যান। যিনি মন্দ কাজ ত্যাগ করিয়ে ভাল কাজের দিকে নিয়ে যান তিনিই সন্ত। যিনি পাপ কাজ থেকে বাঁচান তিনি সন্ত আর যিনি পাপ-পুণ্য দুটো থেকেই বাঁচান তিনিই জ্ঞানীপুরুষ। সন্তপুরুষ সঠিক রাস্তায় নিয়ে যান আর জ্ঞানীপুরুষ মুক্তি দেন। জ্ঞানীপুরুষ তো অন্তিম বিশেষণ বলা যায় যিনি আপনার কার্য সম্পন্ন করে দেবেন।

সত্যিকারের জ্ঞানী কে? যাঁর মধ্যে অহংকার আর মমতা দুটোই নেই। যাঁর আত্মার সম্পূর্ণ অনুভব হয়েছে তিনিই 'জ্ঞানীপুরুষ'। তিনি পুরো ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণন করতে সক্ষম, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। 'জ্ঞানীপুরুষ' মানে পৃথিবীর এক আশ্চর্য', 'জ্ঞানীপুরুষ' মানে জ্বলন্ত প্রদীপ।

জ্ঞানীপুরুষের পরিচয়

প্রশ্নকর্তা ঃ জ্ঞানীপুরুষকে কেমন করে চিনব?

দাদাশ্রী ঃ জ্ঞানীপুরুষ তো কোন কিছু না করেই চেনা যায় এমনই হন। ওনার বাতাবরনই অন্যরকম হয়। ওনার সুগন্ধ থেকে, শব্দ থেকে চেনা যায়। ওনার চোখ দেখলেও চেনা যায়। জ্ঞানীর বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে, প্রচন্ড বিশ্বাসযোগ্যতা।

যদি বুঝতে পারো তো ওনার প্রত্যেকটা শব্দই শাস্ত্রস্বরূপ, ওনার বাণী, কাজ আর বিনয় মনোহর হয়, মনকে হরণ করে নেয়। এইরকম জ্ঞানীকে চেনার অনেক লক্ষণ আছে।

জ্ঞানীপুরুষ অবুধ (যাঁর বুদ্ধির কোন উপযোগ নেই) হন। যিনি আত্মার জ্ঞানী তিনি তো পরম সুখী - তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও দুঃখ থাকে না। এইজন্য তাঁর কাছে নিজের কল্যাণ হয়। যিনি নিজের কল্যাণ করতে পেরেছেন তিনিই অন্যের কল্যাণ করতে সক্ষম। যিনি নিজে সাঁতার কাটতে পারেন তিনিই তো কাউকে কিনারায় পৌঁছাতে পারবেন। এখানে তো লক্ষ লোক সাঁতরে পার হয়ে যায়।

শ্রীমৎ রাজচন্দ্রজী জ্ঞানীপুরুষের সংজ্ঞায় বলেছেন, জ্ঞানীপুরুষ তাঁকেই বলা যায় যাঁর কোন কিছুর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও স্পৃহা নেই; জগতের কোন বস্তুর প্রতি যাঁর বিন্দুমাত্রও আকাঙ্খা নেই, শিষ্য করারও ইচ্ছে নেই উপদেশ দেওয়ার-ও ইচ্ছে নেই, কোন রকম গর্ব নেই অহংকার নেই কোন রকম কর্তাভাব নেই।

৭. জ্ঞানীপুরুষ - এ. এম. প্যাটেল (দাদাশ্রী)

'দাদাভগবান' যিনি চৌদ্দ লোকের নাথ তিনি আপনার মধ্যেও আছেন কিন্তু অপ্রকট রূপে। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর এখানে উনি ব্যক্ত হয়েছেন। যিনি ব্যক্ত হয়েছেন, প্রকট হয়েছেন তিনিই ফল দিতে পারেন। একবারও যদি ওনার নাম নাও তো কাজ হয়ে যাবে - এমনই। আর চিনে বললে কল্যান হবে, সাংসারিক বাধাবিপত্তি দুর হয়ে যাবে।

এখানে যাঁকে দেখা যাচ্ছে তিনি 'দাদাভগবান' নন। আপনি যাঁকে দেখছেন তাঁকেই 'দাদাভগবান' বলে মনে করছেন? কিন্তু যাঁকে দেখছেন তিনি ভাদ্‌রন-এর প্যাটেল। আমি 'জ্ঞানীপুরুষ' আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনি-ই 'দাদাভগবান'। আমি নিজে ভগবান নই। আমার ভিতরে প্রকট 'দাদাভগবান'-

কে আমিও নমস্কার করি। আমার আর 'দাদা ভগবান'-এর মধ্যে ভিন্নতার-ই ব্যবহার বিদ্যমান। কিন্তু লোকে মনে করে যে ইনি স্বয়ং-ই দাদা ভগবান। না, নিজে দাদা ভগবান কি করে হবে? এ তো ভাদ্রন-এর প্যাটেল।

(এই জ্ঞান নেওয়ার পর) দাদাজী-র আজ্ঞা পালন করা মানে তা এ. এম. প্যাটেলে-এর আজ্ঞা পালন করা নয়। স্বয়ং 'দাদাভগবান' যিনি চৌদ্দ লোকের নাথ, এ হল তাঁর আজ্ঞা; এর গ্যারান্টি দিচ্ছি। এইসব কথা তো আমার মাধ্যমে বলা হচ্ছে। এ আমার আজ্ঞা নয়, দাদা ভগবান-এর আজ্ঞা। এইজন্যে আপনাকে এই আজ্ঞা পালন করতে হবে। আমি-ও এই ভগবান-এর আজ্ঞা পালন করি।

৮. ক্রমিক মার্গ - অক্রম মার্গ

মোক্ষ প্রাপ্ত করার দুটি রাস্তা আছে - এক 'ক্রমিক মার্গ' আর অন্যটা 'অক্রম মার্গ'। ক্রমিক মানে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা। ক্রমিক মার্গে যেমন যেমন পরিগ্রহ কম হতে থাকবে তেমনি মোক্ষের দিকে অগ্রসর হবে কিন্তু তাতে বহুকাল কেটে যাবে। আর এই অক্রম বিজ্ঞান কি? সিঁড়ি চড়ে উপরে উঠতে হবে না, লিফট্-এ বসে সোজা বারোতলায় পৌঁছে যাবে - এটা এরকম 'লিফট্'-মার্গ। সমস্ত দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে, সন্তানদের বিবাহ দিয়ে 'লিফট্'-এ বসে মোক্ষে পৌঁছে যাবে! এইসব সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেও মোক্ষ হাতছাড়া হবে না; এইরকম অক্রম-মার্গকে অপবাদ-মার্গও বলা হয়। এই মার্গ দশলক্ষ বছরে একবার প্রকট হয়। যে এই 'লিফট্'-এ বসবে তারই কল্যাণ হবে। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। যে এই 'লিফট্'-এ বসে গেছে তারই সমস্যার সমাধান হয়েছে। সমস্যার সমাধান তো করতেই হবে। আমি যে এই 'লিফট্'-এ বসে মোক্ষমার্গে এগোচ্ছি তার প্রমান কি? এর প্রমান হল ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ দূর হবে, আর্তধ্যান-রৌদ্রধ্যান থাকবে না। তাহলেই কাজ পুরো হয়ে গেলো, কেমন?

অক্রম আত্মানুভূতি করায় সহজ পথে

ক্রমিকমার্গে অনেক চেষ্টার পরে-ই আত্মা আছে, এই ধ্যান সম্ভব হয় - তাও খুব অস্পষ্টভাবে আর লক্ষ্যস্থির তো হয়ই না। এতে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে আত্মা এইপ্রকার। আর অক্রমমার্গে আপনার তো সোজাসুজি আত্মানুভূতি হয়ে যাচ্ছে। মাথাব্যাথা করছে, খিদে পাচ্ছে ইত্যাদি বাইরের শত সমস্যাতেও অন্তরের সুখের অনুভূতি যায় না - একেই আত্মানুভব বলে।

আত্মানুভব দুঃখকেও সুখে পরিবর্তিত করে আর অজ্ঞান অবস্থায় সুখেও দুঃখ-ই অনুভূত হয়।

এটা অক্রম বিজ্ঞান সেইজন্যে এত তাড়াতাড়ি সম্‌কিত হয়ে যায়-এটা খুবই উচ্চস্তরের বিজ্ঞান। আত্মা আর অনাত্মা অর্থাৎ আপনার নিজস্ব আর পরস্ব বস্তুর মধ্যে এই বিভাজন করে দিই যে এটা আপনার আর এটা আপনার নয়; মাত্র একঘন্টার মধ্যেই এই দুইয়ের ভেদরেখা টেনে দিই। আপনি নিজে পরিশ্রম করে করতে গেলে লক্ষ জন্ম পার করেও কোন রকমেই করতে পারবেন না।

আমার সাথে যার সাক্ষাৎ হয়েছে সেই অধিকারী

প্রশ্নকর্তা ঃ এই মার্গ এত সহজ তো এতে পাত্রতা বা যোগ্যতা দেখা হয় না? যে কেউ কি এটা পেতে পারে?

দাদাশ্রী ঃ লোকে আমাকে প্রশ্ন করে 'আমি কি এর যোগ্য?' আমি তাকে বলি 'আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে এইজন্যে তুমি অধিকারী'। এই সাক্ষাৎকারের পিছনে তো 'ব্যবস্থিত'-ই (সায়েন্টিফিক সার্কামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স) কাজ করছে। আমার সাথে যারই সাক্ষাৎ হয় সেই অধিকারী। ওর সাথে কেন দেখা হয়? ও অধিকারী বলেই আমার সাক্ষাৎ পায়। আমার সাথে দেখা হওয়ার পরেও যদি ওর প্রাপ্তি না হয় তাহলে ওর অন্তরায় কর্ম বাধা হয়েছে।

ক্রম-এ করতে হয় আর অক্রম-এ.......

একভাই একবার প্রশ্ন করেছিল যে ক্রম আর অক্রম-এর মধ্যে পার্থক্য কি? আমি বললাম, ক্রম মানে যেমন সকলে বলে যে ভুল ছেড়ে ঠিকটা ধরো। বার বার এটা বলা-এর নাম ক্রমিক মার্গ। ক্রমে-এ সব ছাড়তে বলা হয় - এই লোভ-কপট ছাড়ো আর ভাল কাজ করো। এতদিন পর্য্যন্ত এই দেখেছেন না? আর এই অক্রম মানে কিছু করাই নয় - এখানে করোমি-করোসি-করোতি নেই!

অক্রমবিজ্ঞান তো খুব বড় আশ্চর্য। এখানে আত্মজ্ঞান নেওয়ার পরদিন-ই ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন আসে। এটা শুনেই লোকে এই বিজ্ঞান স্বীকার করে আর এখানে আসার জন্যে আকর্ষিত হয়।

অক্রম-এ ভিতর থেকেই মূল রূপে শুরু হয়। ক্রমিক মার্গে তো শুদ্ধতাও

ভিতর থেকে শুরু হয় না কারণ এরকম ক্ষমতা নেই। ভিতরের পদ্ধতি জানা নেই বলে বাইরের পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে কিন্তু এই বাইরের পদ্ধতি ভিতরে কবে পৌঁছাবে? মন-বচন-কায়ার একতা থাকলে তবেই তা ভিতরে পৌঁছাবে আর তারপর ভিতরে শুরু হবে। আজকাল তো মন-বচন-কায়ার একতা-ই নেই।

একাত্মযোগ নষ্ট হওয়ায় অপবাদরূপে প্রকট হয়েছে অক্রম।

জগৎ পর্যায়ক্রমে আগে এগোনোর মোক্ষ মার্গ খুঁজে বার করেছে কিন্তু এই পথ ততক্ষণ পর্যন্তই কাজ করে যতক্ষণ মনে যা আছে তা কথায় বলা হয় এবং তেমনই কাজেও তা দেখা যায় - নইলে এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এইকালে মন-বচন-কায়ার একাত্মতা নষ্ট হয়ে গেছে সেইজন্যে ক্রমিক মার্গ-ও ভঙ্গ হয়ে গেছে। এইজন্যেই বলছি ক্রমিকমার্গের ভিত্তি পচে গেছে আর সেই কারনেই এই অক্রমমার্গ দেখা দিয়েছে। এই মার্গে সবকিছুই মেনে নেওয়া হয়; তুমি যেমন তোমাকে তেমনই মেনে নেওয়া হয় শুধু তুমি এখানে আমার সাক্ষাৎ করলেই হবে। মানে আমাকে আর অন্য কোনরকম ঝঞ্ঝাট-ই করতে হয় না।

'জ্ঞানী'-র কৃপাতে-ই 'প্রাপ্তি'

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি যে অক্রমমার্গ-এর কথা বললেন তা আপনার মত জ্ঞানী-র জন্যে উপযুক্ত, সরল। কিন্তু আমার মত সাধারন সংসারী লোকের জন্যে তো মুস্কিল। এর কি উপায় আছে?

দাদাশ্রী ঃ 'জ্ঞানীপুরুষ'-এর মধ্যে তো চৌদ্দ লোকের দেবতা স্বয়ং ভগবান প্রকট হয়েছেন - এরকম 'জ্ঞানী'-র সাক্ষাৎ হলে আর কি বাকি থাকে? আপনার শক্তিতে করতে হবে না, ওনার কৃপাতেই হয়। কৃপাতে সবকিছু বদলে যায়। সেইজন্যে এখানে আপনি যা কিছু চাইবেন সে সমস্তই পাবেন। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনাকে শুধু 'জ্ঞানীপুরুষ'-এর আজ্ঞাতে থাকতে হবে। এটা তো 'অক্রম বিজ্ঞান' মানে প্রত্যক্ষ ভগবানের কাছ থেকে আপনাকে কাজ পুরো করে নিতে হবে আর উনি তো সর্বক্ষণ-ই আছেন, এক-দু'ঘন্টা নয়।

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে ওনাকে সব সমর্পণ করলে তবে-ই উনি সব করে দেন?

দাদাশ্রী ঃ উনিই সব করবেন আপনাকে কিছুই করতে হবে না। করতে গেলে তো নতুন করে কর্মবন্ধন হবে। আপনাকে শুধু লিফ্‌ট-এ বসতে হবে

আর পাঁচ আজ্ঞা-র পালন করতে হবে। লিফ্ট-এ বসে লাফালাফি করবেন না, হাত বাইরে বার করবেন না - শুধু এটুকুই আপনাকে করতে হবে। এইরকম রাস্তা কখনো কখনো খোলে - তা শুধু পুণ্যবানদের-ই জন্যে। বিশ্বের এটা এগারোতম আশ্চর্য বলা হয়। অপবাদে যে টিকিট পেয়ে গেছে তার কাজ হয়ে গেছে।

অক্রমমার্গ চালু আছে

এতে আমার কামনা তো এইটুকুই যে, আমি যে সুখ পেয়েছি সেই সুখ আপনিও পান। অর্থাৎ এই যে বিজ্ঞান প্রকট হয়েছে তা হঠাৎ-ই নষ্ট না হয়। আমি আমার পরে জ্ঞানীদের কয়েক পীঢ়ি (কয়েক পুরুষ) রেখে যাব আর উত্তরাধিকারী রেখে যাব। তারপরেও জ্ঞানীদের পরম্পরা চলবে। এইজন্যে জীবন্ত জ্ঞানীকেই খুঁজবে। উনি ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না। আমি তো নিজের হাতে কয়েকজনকে সিদ্ধি প্রদান করব। আমার পরে কাউকে চাই তো? বাকী লোকেদের জন্যে রাস্তা তো দরকার?

৯. জ্ঞানবিধি কি?

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার জ্ঞানবিধি কি?

দাদাশ্রী ঃ জ্ঞানবিধি আত্মা আর পুদ্‌গল (অনাত্মা)-কে পৃথক করা। শুদ্ধচেতন আর পুদ্‌গল-এর পৃথকীকরন (সেপারেশন)

প্রশ্নকর্তা ঃ এই সিদ্ধান্ত তো ঠিক আছে কিন্তু এর পদ্ধতি কি?

দাদাশ্রী ঃ এতে লেন-দেন এর কোন ব্যাপার নেই। কেবল এখানে বসে যেমন বলব ঠিক তেমনিভাবে বলতে হবে। 'আমি কে'-র জ্ঞান, পরিচয় দু-ঘন্টার জ্ঞান প্রয়োগে হয়। এর মধ্যে ৪৮ মিনিট আত্মা-অনাত্মাকে পৃথক করার ভেদবিজ্ঞান-এর বাক্য বলানো হয়; সবাইকে একসাথে এগুলো বলতে হয়। এর পরে একঘন্টায় পাঁচ-আজ্ঞা উদাহরন দিয়ে সবিস্তারে বোঝানো হয় যাতে বাকি জীবনটা এমনভাবে কাটানো যায় যে নতুন কর্মবন্ধন আর না হয়, পুরাতন কর্ম সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায় এবং সাথে 'আমি শুদ্ধাত্মা'-এই জাগৃতি সবসময় থাকে।

১০. জ্ঞানবিধি-তে কি হয়?

আমি জ্ঞান দিই, এতে কর্ম ভস্মীভূত হয়ে যায় আর সেইসময় অনেক

আবরন নষ্ট হয়। তখন-ই ভগবানের কৃপা হয় এবং উনি নিজে জাগৃত হন। এই জাগৃতি চলে যায় না, নিরন্তর জাগৃত থাকেন। মানে নিরন্তর প্রতীতি থাকবেই। আত্মার অনুভব হওয়া মানে দেহাধ্যাস চলে যাওয়া। দেহাধ্যাস দূর হয়ে যাওয়া মানে কর্মবন্ধন আর হয় না। প্রথম মুক্তি অজ্ঞান থেকে হয়; পরে এক-দু জন্মে অন্তিম মুক্তি পাওয়া যায়।

জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম ভস্মীভূত হয়

যেদিন এই জ্ঞান দিই সেদিন কি হয়? যে কর্ম ছিল তা জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যায়। দুই প্রকার কর্ম ভস্মীভূত হয় আর এক প্রকারের কর্ম বাকি থাকে। যে কর্ম বাষ্প-স্বরূপ তা নষ্ট হয়ে যায়, যে কর্ম জল-স্বরূপ তাও নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু যে কর্ম বরফের মতো জমে গেছে তার নাশ হয় না। কেন না তা জমাট বেঁধে আছে। যে কর্ম ফল দেওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেছে তা ছাড়ে না। কিন্তু বাষ্প আর জলের মত যে কর্ম তা জ্ঞানাগ্নি ভস্ম করে দেয়। সেইজন্যে জ্ঞান পেতেই লোক একদম হাল্কা হয়ে যায়, জাগৃতি অনেক বেড়ে যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম ভস্মীভূত না হচ্ছে ততক্ষণ জাগৃতি বাড়ে না। বরফের মত জমে যাওয়া কর্ম তো ভোগ করতেই হবে। সেই কর্মভোগ যাতে সহজ হয় তার উপায় তো আমি বলে দিয়েছি, 'ভাই, এই 'দাদাভগবান-এর অসীম জয়জয়কার হোক' বলবে, ত্রিমন্ত্র বলবে, ন' কলাম বলবে।'

সংসার দুঃখ-এর অভাব-কেই মুক্তির প্রথম অনুভব বলে। যখন আমি জ্ঞান দিই তখন দ্বিতীয় দিন থেকেই তা শুরু হয়ে যায়। তারপরে যখন এই শরীরের বোঝা, কর্মের বোঝা সব নষ্ট হয়ে যায় তখন দ্বিতীয় অনুভব। তখন তো এত আনন্দ হয় যে তার কোন বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব!

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার কাছ থেকে যে জ্ঞান পেয়েছি সেটাই তো আত্মজ্ঞান?

দাদাশ্রী ঃ যা পাওয়া যায় তা আত্মজ্ঞান নয়, ভিতরে যা প্রকট হয় তাই আত্মজ্ঞান। আমি বলাই আর আপনি বলেন - তাতেই পাপ ভস্মীভূত হয় আর ভিতরে জ্ঞান প্রকট হয়। আপনার হয়েছে কি না?

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ, হয়ে গেছে।

দাদাশ্রী ঃ আত্মা প্রাপ্ত করা কি সহজ কথা? জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর কি হয়? আত্মা আর দেহ পৃথক হয়ে যায়। তৃতীয় আর কি হয়? ভগবান-এর কৃপা নেমে আসে যাতে নিরন্তর জাগৃতি উৎপন্ন হয় - তাতে প্রজ্ঞাশক্তির আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয়া থেকে পূর্ণিমা

আমি যখন জ্ঞান দিই তখন অনাদিকালের অর্থাৎ লক্ষ জন্মের যে অমাবস্যা ছিল, অমাবস্যা আপনি বুঝলেন? 'চন্দ্রহীন' অনাদিকাল থেকে অন্ধকারেই সবাই বেঁচে থাকে। আলো দেখেই নি; চাঁদ দেখেই নি। আমি যখন এই জ্ঞান দিই তখন চন্দ্রমা প্রকট হয়। প্রথমে তা দ্বিতীয়ার চাঁদের মত আলো দেয়। সম্পূর্ণ জ্ঞান দিই কিন্তু ভিতরে প্রকট হয় কতটা? দ্বিতীয়ার চাঁদের মত। এই জন্মেই পূর্ণিমা হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে সাধনা করতে হবে। দ্বিতীয়া থেকে তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী হবে আর পূর্ণিমা হয়ে গেলে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে অর্থাৎ কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত হবে। কোন কর্ম আর বাকী থাকবে না, কর্মবন্ধনও থেমে যাবে। ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ থাকবে না। আগে নিজেকে যে 'চন্দুভাই' বলে মনে করতেন সেটা ভ্রান্তি। 'আমি চন্দুভাই'-এই ভ্রান্তি দূর হয়েছে। এখন যে আজ্ঞা আপনাকে দেওয়া হল সেই আজ্ঞায় থাকবেন।

এখানে জ্ঞানবিধিতে এলে আমি সমস্ত পাপ ধুয়ে দেব, তখন আপনি নিজের দোষ দেখতে পাবেন। আর যখন নিজের দোষ দেখতে পারবেন তখন থেকেই বুঝবেন মোক্ষ-এ যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

১১. আত্মজ্ঞান পাওয়ার পর আজ্ঞা পালন করার মহত্ব

আজ্ঞা, জ্ঞান-এর রক্ষণের জন্যে

আমার জ্ঞান দেওয়ার পর আপনার যখন আত্মানুভূতি হয় তখন আর কি কাজ বাকি থাকে? 'জ্ঞানীপুরুষ'-এর আজ্ঞা পালন করা। 'আজ্ঞা'-ই ধর্ম আর 'আজ্ঞা'-ই তপ। আর আমার আজ্ঞা সংসারের জন্যে বিন্দুমাত্র বাধা নয়। সংসারে থেকেও সংসার স্পর্শ না করে এইরকম এই অক্রমবিজ্ঞান।

এই কাল-ই এমন যে সর্বত্র-ই কুসঙ্গ আছে। রান্নাঘর থেকে অফিস, ঘরে, রাস্তায়, বাইরে, গাড়িতে, ট্রেনে - সর্বত্র কুসঙ্গই পাওয়া যায়। এই যে জ্ঞান আমি আপনাকে দু-ঘন্টাতে দিয়েছি কুসঙ্গ আছে বলেই তাকে কুসঙ্গ নষ্ট করে দেবে। করবে কি না? এইজন্যে পাঁচ আজ্ঞার রক্ষণ বেড়া দিয়ে দিই যাতে এটা জ্ঞানকে রক্ষা করে আর ভিতরে বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হতে না দেয়। এই জ্ঞান যেমন দেওয়া হয়েছিল তেমন স্থিতিতেই থাকবে। যদি বেড়া ভেঙে যায় তাহলে জ্ঞানকে নষ্ট করে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।

আমি এইযে জ্ঞান দিয়েছি তা ভেদজ্ঞান আর সেটা আত্মা-অনাত্মাকে আলাদা করে দেয়। কিন্তু এরা যাতে আলাদাই থাকে তারজন্যে এই পাঁচ বাক্য

আমি আপনার রক্ষার জন্যে দিচ্ছি কারন এটা কলিযুগ-এই কলিযুগে সব লুটে নিয়ে না যেতে পারে। বোধবীজ থেকে চারা বেরোলে জল দিতে হবে না কি? বেড়া দিতে হবে না কি?

জ্ঞান-এর পরে কি ধরনের সাধনা?

প্রশ্নকর্তা ঃ এই জ্ঞানের পরে কি ধরনের সাধনা করতে হবে?

দাদাশ্রী ঃ এই যে পাঁচ আজ্ঞার পালন করছো ওটাই সাধনা। আর অন্য কোন সাধনা করতে হবে না। অন্য সাধনা তো বন্ধনের কারণ; এই পাঁচ আজ্ঞাই মুক্তি দেবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ পাঁচ আজ্ঞাতে এমন কি আছে?

দাদাশ্রী ঃ পাঁচ আজ্ঞার একটা বেড়া দেওয়া হয় যাতে আপনার ভিতরের জিনিস কেউ চুরি করতে না পারে। এই বেড়া যদি আপনি দিয়ে রাখতে পারেন তাহলে যে জ্ঞান আমি আপনাকে দিয়েছি তা ভিতরে একইরকম থাকবে কিন্তু বেড়াতে একটুও ঢিলা দিলে কেউ ঢুকে ক্ষতি করে যাবে। তখন আমাকে আবার আসতে হবে তা ঠিক করতে। যতক্ষণ পাঁচ আজ্ঞায় থাকবেন ততক্ষণ নিরন্তর সমাধির প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি।

আজ্ঞা থেকেই তীব্র প্রগতি হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার জ্ঞান পাওয়ার পর মহাত্মাদের যে প্রগতি হয় তার গতি কিসের উপর আধারিত? কি করলে তাড়াতাড়ি প্রগতি হবে? (টীকা ঃ দাদার জ্ঞান যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের মহাত্মা বলা হয়)

দাদাশ্রী ঃ পাঁচ আজ্ঞা পালন করলেই সবকিছু তাড়াতাড়ি হবে আর পাঁচ আজ্ঞাই এর কারণ। পাঁচ আজ্ঞা পালন করলে আবরন ক্ষয় হয়, সমস্ত শক্তি প্রকট হয়, ঐশ্বর্য্য প্রকট হয়। যে শক্তি অব্যক্ত আছে তা ব্যক্ত হয়। আজ্ঞা পালন করার উপরেই তা নির্ভর করছে।

আমার আজ্ঞার প্রতি আন্তরিকতা থাকাটাই সব থেকে দরকারী এবং মুখ্য গুণ। আমার আজ্ঞা পালন করে যে অবুধ (যার বুদ্ধির ব্যবহার নেই) হয়েছে সে আমার মতই হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন আজ্ঞা পালন করতে হবে ততদিন আজ্ঞায় কোনরকম পরিবর্তন হওয়া উচিৎ নয়। তাহলে অসুবিধা হবে না।

দৃঢ়নিশ্চয় করলে আজ্ঞা পালন

দাদার আজ্ঞা পালন করে চলতে হবে এই ভাবটাই সব থেকে বড়। আজ্ঞা পালন করতে হবে এটা স্থিরনিশ্চয় করুন। পালন হচ্ছে কি হচ্ছে না তা আপনার দেখার দরকার নেই। আজ্ঞা যতটা পালন করতে পারবেন করবেন কিন্তু আপনাকে স্থিরনিশ্চয় করতে হবে যে আজ্ঞাপালন করবো।

প্রশ্নকর্তা ঃ আজ্ঞা পালন করতে যদি কম-বেশী হয় তাতে ক্ষতি নেই তো?

দাদাশ্রী ঃ ক্ষতি নেই এরকম নয়। আপনাকে নিশ্চয় করতে হবে যে আজ্ঞা পালন করতেই হবে। সকালে উঠেই দৃঢ়নিশ্চয় করবেন যে 'আমাকে পাঁচ আজ্ঞাতেই থাকতে হবে, পাঁচ আজ্ঞা পালন করতে হবে'। এরকম ঠিক করলেই আমার আজ্ঞাতে এসে যাবেন আর আমার এটুকুই চাই।

আজ্ঞা পালন করতে ভুলে গেলে প্রতিক্রমন করবেন, ''হে দাদা, দু'ঘন্টার জন্যে আপনার আজ্ঞা ভুলে গেছিলাম, কিন্তু আমাকে তো আজ্ঞা পালন করতেই হবে। আমাকে ক্ষমা করুন।'' তাহলেই সমস্ত পরীক্ষাতে পাস - ১০০তে ১০০ নম্বরই পাবে। এতে কোন বিপদ থাকবে না। আজ্ঞাতে থাকলে সংসার স্পর্শ করবে না। আমার আজ্ঞা পালন করলে আপনাকে কিছুই স্পর্শ করবে না।

'আজ্ঞা' পালন থেকেই যথার্থ পুরুষার্থের শুরু

আমি আপনাকে জ্ঞান দিয়ে আপনার প্রকৃতি থেকে আলাদা করেছি। 'আমি শুদ্ধাত্মা' মানে পুরুষ আর এটাই যথার্থ পুরুষার্থ, সত্যিকারের পুরুষার্থ।

প্রশ্নকর্তা ঃ সত্যিকারের (রিয়েল) পুরুষার্থ আর আপেক্ষিক (রিলেটিভ) পুরুষার্থ-এই দুই-এর পার্থক্য কি?

দাদাশ্রী ঃ রিয়েল পুরুষার্থ-তে কিছু করতে হয় না। দু'টোর মধ্যে পার্থক্য এই যে সত্যিকারের পুরুষার্থ অর্থাৎ 'দেখা' আর 'জানা' আর রিলেটিভ পুরুষার্থ মানে ভাবনা করা যে 'আমি এইরকম করব'।

আপনি 'চন্দুভাই' ছিলেন আর পুরুষার্থ করতেন সেটা ভ্রান্তির পুরুষার্থ ছিল কিন্তু যখন 'আমি শুদ্ধাত্মা'-র প্রাপ্তি হয়েছে তারপরে পুরুষার্থ করুন, পাঁচ আজ্ঞায় থাকুন সেটা রিয়েল পুরুষার্থ, সত্যিকারের পুরুষার্থ। পুরুষ (পদ)-এর প্রাপ্তির পরই পুরুষার্থ করছেন তা বলা যাবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ এই যে জ্ঞানের বীজ বুনেছেন এই কি প্রকাশ, এই কি জ্যোতি?

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, কিন্তু বীজরূপে; এরপর আস্তে আস্তে পূর্ণিমা হবে। পুদ্গল আর পুরুষ-দুই আলাদা হলে তখন থেকেই ঠিক পুরুষার্থ শুরু হয়। যেখানে পুরুষার্থ শুরু হয়েছে সেখানে দ্বিতীয়া থেকে পূর্ণিমা হয়ে যাবে। এই আজ্ঞার পালন করলে তবে-ই হবে। আর কিছু করতে হবে না শুধু আজ্ঞাপালন করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ দাদা পুরুষ হওয়ার পরের পুরুষার্থের বর্ণনা একটু দিন। এটা ব্যক্তি কিভাবে ব্যবহার করবেন?

দাদাশ্রী ঃ এঁরা সবাই থাকেন, এই যে সমস্ত মহাত্মারা সবাই পাঁচ আজ্ঞায় থাকেন। পাঁচ আজ্ঞাই সত্যিকারের পুরুষার্থ। পাঁচ আজ্ঞা পালনের ফলে জ্ঞাতা-দ্রষ্টা পদে থাকা যায়। আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে সঠিক পুরুষার্থ কি? তো আমি বলব জ্ঞাতা-দ্রষ্টা থাকা। এই পাঁচ আজ্ঞা তো জ্ঞাতা-দ্রষ্টা থাকতেই শেখায়। যেখানে আন্তরিকভাবে পুরুষার্থ শুরু হয়েছে সেখানে আমার কৃপাবর্ষণ অবশ্যই হয়।

১২. আত্মানুভব তিনটি ধাপে, অনুভব-লক্ষ্য-প্রতীতি

প্রশ্নকর্তা ঃ আত্মার অনুভব হলে কি হয়?

দাদাশ্রী ঃ আত্মার অনুভব হলে দেহাধ্যাস চলে যায়। দেহাধ্যাস চলে গেলে কর্মের বন্ধন থেমে যায়। আর এর চেয়ে বেশী কি চাই?

আগে 'চন্দুভাই' কোথায় ছিল আর এখন কোথায় আছে তা বুঝতে পারেন। এই পরিবর্তন কি করে হল? আত্ম-অনুভব থেকে; আগে দেহাধ্যাস ছিল, এখন এটা আত্মার অনুভব।

প্রতীতি অর্থাৎ সম্পূর্ণ মান্যতা একশো ভাগ বদলে গেছে আর 'আমি শুদ্ধাত্মা' এই বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে গেছে। 'আমি শুদ্ধাত্মা' এই শ্রদ্ধা আসে আবার চলে যায় কিন্তু প্রতীতি কখনও চলে যায় না। শ্রদ্ধা বদলে যায়, প্রতীতি বদলায় না।

প্রতীতি মানে ধরে নাও আমি এই কাঠ এখানে রাখলাম - এখন এর উপরে অনেক ভার দিলে তা বেঁকে যাবে কিন্তু জায়গা ছাড়বে না। তেমনি যত কর্মের উদয়-ই হোক না কেন, অসৎ কর্মের-ও উদয় হোক প্রতীতি কিন্তু স্থানত্যাগ করবে না। 'আমি শুদ্ধাত্মা'-এই ভাব কখনও চলে যাবে না।

অনুভব, লক্ষ্য আর প্রতীতি এই তিনটেই থাকবে। প্রতীতি সব সময়ের জন্যে থাকবে। লক্ষ্য মাঝে মাঝে চলে যাবে। ব্যাবসা বা কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে লক্ষ্য চলে যাবে, কাজ শেষ হলে আবার ফিরে আসবে। আর অনুভব তো তখনই হবে যখন কর্মহীন অবস্থায় একান্তে বসে আছেন - তখন অনুভবের স্বাদ পাবেন। যদিও অনুভব ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে।

অনুভব, লক্ষ্য আর প্রতীতি; এর মধ্যে প্রতীতি-ই মুখ্য - এটাই আধার। এই আধার তৈরী হওয়ার পর লক্ষ্য উৎপন্ন হয়। তারপরে 'আমি শুদ্ধাত্মা' - এটা নিরন্তর লক্ষ্যে থাকে আর যখন একান্তে বসে জ্ঞাতা-দ্রষ্টা থাকা যায় তখন তা অনুভবে আসে।

১৩. প্রত্যক্ষ সৎসঙ্গের মহত্ত্ব

সমস্যার সমাধানের জন্যে সৎসঙ্গ প্রয়োজন

এই অক্রমবিজ্ঞান-এর মাধ্যমে আপনারও আত্মানুভব প্রাপ্ত হয়েছে। এটা আপনি সহজে পেয়েছেন - এতে আপনার নিজের লাভ হবে, প্রগতিও করতে পারবেন। কিন্তু 'জ্ঞানী'-র কাছ থেকে বিশেষভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

এই জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে বুঝতে হবে কারণ এক ঘন্টায় এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। এত বিশাল জ্ঞান! এককোটি বছরেও যা সম্ভব নয় তা এক ঘন্টায় হয়ে যায়। কিন্তু বেসিক মানে বুনিয়াদী-রূপে হয়। একে সবিস্তারে বুঝে নিতে হবে না? একে সূক্ষ্মভাবে বোঝার জন্যে আপনি আমার কাছে বসে প্রশ্ন করলে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেব। এইজন্যেই আমি বলি যে সৎসঙ্গ খুবই দরকার। আপনি যে যে বিষয়ে এখানে প্রশ্ন করবেন সেই সেই বিষয়ের গ্রন্থি আপনার ভিতর খুলে যাবে। যারই কোন সন্দেহ থাকবে তারই প্রশ্ন করা উচিৎ।

বীজ বোনার পরে জলসেচ করাও দরকার

প্রশ্নকর্তা ঃ জ্ঞান নেওয়ার পরেও 'আমি শুদ্ধাত্মা'-এই কথা খেয়ালে রাখতে হয় - এটা বেশ কঠিন।

দাদাশ্রী ঃ না, এরকম হওয়া উচিৎ নয়। খেয়ালে রাখতে হবে না - নিজে থেকেই থাকবে। এরজন্যে কি করা দরকার? এর জন্যে আমার কাছে বারবার আসতে হবে। যতটা জল দেওয়া দরকার তা দেওয়া হয় না বলেই এই সমস্ত মুস্কিল হয়। আপনি যদি ব্যাবসায় মন না দেন তো ব্যাবসার কি হবে?

প্রশ্নকর্তা ঃ ক্ষতি হবে নিশ্চয়ই।

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, এখানেও সেইরকম। জ্ঞান নেওয়ার পর তাতে জল দিতে হবে, তবেই চারা বড় হবে। ছোট চারা থাকলে জল দিতে হয়। মাসে-দুমাসে জল ছিটানো দরকার।

প্রশ্নকর্তা ঃ ঘরে তো জল দিই।

দাদাশ্রী ঃ না, ঘরে দিলেই হবে না। এরকম চলে কি? সামনা-সামনি দরকার, যখন জ্ঞানী স্বয়ং উপস্থিত আছেন। আপনার তাঁর কদরই নেই!... স্কুলে গিয়েছেন? কত বছর স্কুলে পড়েছেন?

প্রশ্নকর্তা ঃ দশ বছর।

দাদাশ্রী ঃ তো সেখানে কি শিখলেন? ভাষা! ইংরেজী ভাষা শেখার জন্যে দশ বছর ব্যয় করলেন আর এখানে তো ছ'মাসের কথা বলছি। ছ'মাস যদি আমার সাথে ঘোরো তো তোমার কাজ হয়ে যাবে।

নিশ্চয় স্ট্রং তো অন্তরায় ব্রেক

প্রশ্নকর্তা ঃ বাইরের কর্মসূচি তৈরি হয়ে গেছে সেইজন্যে আসতে অসুবিধা হবে।

দাদাশ্রী ঃ আপনার ভাবনা যদি মজবুত থাকে তাহলে বাধা দূর হয়ে যাবে। ভিতরে নিজের ভাবনা মজবুত আছে কি নেই সেটা দেখুন। দৃঢ় নিশ্চয় হলে অন্তরায় দূর হয়।

নিয়মিত সৎসঙ্গ করলে সংসারে লাভের প্রতিশ্রুতি

আমার কাছে অনেক ব্যবসায়ী আসেন আর এমন সব ব্যবসায়ী তাঁরা যদি দোকানে একঘন্টা দেরীতে যান তো পাঁচশো-হাজার টাকার লোকসান হবে। ওদেরকে আমি বলেছি যে এখানে এসে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কোন লোকসান হবে না কিন্তু আসার পথে যদি কোন দোকানে আধঘন্টা দাঁড়িয়ে যাও তো লোকসান হবে। এখানে আসলে দায়িত্ব আমার কারণ এর সাথে আমার কোন লেন-দেন নেই। এখানে সবাই নিজের আত্মার জন্যেই আসেন সেইজন্যে সবাইকে বলেছি যে এখানে আসলে আপনাদের লোকসান হবে না; কোন প্রকারের লোকসানই হবে না।

দাদার সৎসঙ্গের অলৌকিকতা

যদি খুব ভারী কর্মের উদয় হয় তখন আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে এই কর্মের উদয় খুব ভারী আর আপনাকে শান্ত থাকতে হবে। কর্মের উদয়কে ঠান্ডা করে আপনি সৎসঙ্গে আসবেন। এই রকম চলতে থাকবে। কখন কেমন কর্মের উদয় হবে তা বলা যায় না।

প্রশ্নকর্তা ঃ জাগৃতি বিশেষভাবে বাড়ে - এর উপায় কি?

দাদাশ্রী ঃ সৎসঙ্গে থাকা - এটাই উপায়।

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনার সাথে ছ'মাস থাকলে প্রথমে স্থূল পরিবর্তন হবে তারপরে সূক্ষ্ম পরিবর্তন হবে - এইরকমই বলছেন কি?

দাদাশ্রী ঃ হ্যাঁ, শুধু বসে থাকলেই পরিবর্তন হতে থাকবে। সেইজন্যে এখানকার পরিচয়ে থাকা চাই - দু'ঘন্টা, তিনঘন্টা, পাঁচ ঘন্টা; যতটা জমা করবে ততটাই লাভ। লোকে জ্ঞান নেওয়ার পর মনে করে আমাকে আর কিছু করতে হবে না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়; এখনও পর্য্যন্ত তো পরিবর্তন হয়-ই নি।

জ্ঞানী-র সান্নিধ্যে থাকো

প্রশ্নকর্তা ঃ মহাত্মাদের পূর্ণ পদ পাওয়ার জন্যে কি করণীয়?

দাদাশ্রী ঃ যতটা সম্ভব জ্ঞানীর কাছে জীবন কাটানো দরকার - এটাই করনীয়; আর কিছু নয়। যেখানেই থাকো না কেন রাত-দিন দাদার কাছেই থাকা উচিৎ। ওনার (অর্থাৎ আত্মজ্ঞানীর) দৃষ্টিপথে বসে থাকো।

এখানে সৎসঙ্গে বসে কর্মের বোঝা কম হতে থাকে আর বাইরে তো কর্মের বোঝা বাড়তেই থাকে। সংসারে তো সমস্যাই সমস্যা। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে যতক্ষণ আপনি সৎসঙ্গে বসে থাকবেন ততক্ষণ আপনার কাজকর্মের কোন ক্ষতি হবে না; হিসাব-নিকাশ করলে দেখবেন যে লাভ-ই হয়েছে। এই যে সৎসঙ্গ এটা কি যেমন-তেমন কোন সৎসঙ্গ? যে শুধু আত্মার জন্যেই সময় দেয় তার সংসারে লোকসান কি করে হবে? শুধু লাভই হয়। কিন্তু এটা বুঝলে তবেই কাজ হবে। এই সৎসঙ্গে থাকা মানে আসা বেকার যাবে না। এখন তো কত সুবিধা - ভগবান মহাবীর-এর সময় পায়ে হেঁটে সৎসঙ্গে যেতে হত। এখন তো বাসে বা ট্রেনে চড়ে তাড়াতাড়িই পৌঁছানো যায়।

প্রত্যক্ষ সৎসঙ্গ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ

এখানে বসে যদি কিছুই না করো তবুও ভিতরে পরিবর্তন হতে থাকবে কারণ সৎসঙ্গ-সৎ মানে আত্মা-তাঁর সান্নিধ্য। এই আত্মা প্রকট হয়েছেন - তাঁর সাথে বসে আছেন। একেই চূড়ান্ত সৎসঙ্গ বলে।

সৎসঙ্গে বসে থাকলে এ সমস্ত খালি হয়ে যাবে কারণ সাথে থেকে 'জ্ঞানী'-কে দেখতে থাকলে তাঁর শক্তি সরাসরি আপনি পাবেন তাতে জাগৃতি অনেক বেড়ে যায়। সৎসঙ্গে থাকতে পারেন এরকম চেষ্টা করতে হবে। এই সৎসঙ্গ-এর সাথে থাকলে কাজ হয়ে যাবে।

কাজ করে নেওয়া মানে কি? যতটা সম্ভব তত বেশী দর্শন করবে। যতটা সম্ভব সামনা-সামনি সৎসঙ্গের লাভ নেবেন-প্রত্যক্ষ সৎসঙ্গ। জ্ঞানীপুরুষের দর্শন করবেন আর ওনার সৎসঙ্গে বসে থাকবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তো তার জন্যে মনে যেন খেদ থাকে।

১৪. দাদার পুস্তক এবং পত্রিকা-র মহত্ত্ব

আপ্তবাণী কিভাবে ক্রিয়াকারী

এ হল জ্ঞানীপুরুষের বাণী - সেইজন্যে সতেজ, বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে। এগুলি পড়লে নিজের পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে আর যেমন যেমন পরিস্থিতি বদলায় তেমনি-ই আনন্দের অনুভূতি হয়। এই বাণী বীতরাগী-র বাণী। রাগ-দ্বেষ রহিত বাণী হলে তা কাজ করে নইলে কাজ হয় না। ভগবান (মহাবীর)-এর বাণীও ফলদায়ী। বীতরাগ বাণী ভিন্ন আর কোন উপায় নেই।

প্রত্যক্ষ সৎসঙ্গ সম্ভব না হলে

প্রশ্নকর্তা ঃ দাদা, যদি সঙ্গে থাকতে না পারি তো বই কতটা সাহায্য করবে?

দাদাশ্রী ঃ সবরকম সাহায্য করবে। এখানকার দাদার সমস্ত জিনিষ-দাদার এই শব্দসমূহ, যা বইতে আছে, দাদার উপদেশ-মানে সমস্ত কিছুই সাহায্য করবে।

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু সাক্ষাৎ সঙ্গ আর এতে পার্থক্য তো থাকবে?

দাদাশ্রী ঃ পার্থক্য দেখতে চাইলে পার্থক্য থাকবে। এইজন্যে আমাকে তো যে সময় যা পাচ্ছি তাই করতে হবে। 'দাদা' যখন নেই তখন কি করবে? দাদাজী-র পুস্তক আছে - তা পড়বেন। পুস্তকে দাদাজী-ই আছেন না? চোখ বন্ধ করলেই দাদাজী-কে দেখতে পাবেন এমন হবে।

১৫. পাঁচ আজ্ঞায় জগৎ নির্দোষ

'স্বরূপজ্ঞান' ছাড়া তো ভুল দেখাই যায় না। কেন-না 'আমি চন্দুভাই', 'আমি নির্দোষ', 'আমি খুব চালাক-চতুর' - এরকম মান্যতা থাকেই। 'স্বরূপজ্ঞান' প্রাপ্তির পর আপনি নিষ্পক্ষপাতী হন আর মন-বচন-কায়া-র উপর আপনার কোন পক্ষপাত থাকে না। ফলে আপনার নিজের ভুল আপনি নিজেই দেখতে পান।

যাঁর নিজের ভুল বোধে আসে, যিনি প্রতিক্ষণ নিজের ভুল দেখতে পান- যেখানে যেখানে ভুল হচ্ছে সেখানেই দেখতে পান আর যেখানে ভুল হয় না তাও দেখতে পান তিনি নিজে স্বয়ং-ই 'পরমাত্মাস্বরূপ' হয়ে গেছেন। 'আমি চন্দুভাই নই, আমি শুদ্ধাত্মা'-এটা বোঝার পরই নিষ্পাক্ষপাতী হওয়া যায়। যখন অন্যের বিন্দুমাত্র দোষ-ও দৃষ্টিগোচর না হয় আর নিজের সমস্ত দোষ দৃষ্টিগোচর হয় তখনই নিজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়।

যখন নিজের দোষ দৃষ্টিগোচর হয় তখন থেকেই আমার দেওয়া 'জ্ঞান' পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর নিজের দোষ দৃষ্টিগোচর হওয়া শুরু হলে অন্যের দোষ দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যের দোষ দেখা - ভয়ানক পাপ কাজ। এই নির্দোষ জগতে যেখানে কেউ দোষী-ই নয় সেখানে কাকে দোষ দেব? যতক্ষণ পর্য্যন্ত দোষ আছে, যতক্ষণ সমস্ত দোষ শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ অহংকার নির্মূল হয় না। আর যতক্ষণ অহংকার নির্মূল না হচ্ছে ততক্ষণ দোষ ধুতে হবে। তারপরেও যদি কেউ দোষী দেখায় তো সেটা নিজের ভুল। কখনো না কখনও তো নির্দোষ দেখতেই হবে। এসব আমার-ই হিসাবের, এটা-ও যদি বুঝে যাও তো অনেক কাজ হয়ে যাবে।

আজ্ঞাপালন থেকে নির্দোষ দৃষ্টির বৃদ্ধি

আমার তো জগৎ নির্দোষ দেখায়। আপনার যখন এরকম দৃষ্টি আসবে তখন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি আপনাকে এত প্রকাশ দেব এবং আপনার এত পাপ ধুয়ে দেব যে আপনার কাছে প্রকাশ থাকে আর নির্দোষ দেখতে পান। আর পাঁচ আজ্ঞা দেব; পাঁচ আজ্ঞায় থাকলে এই যে জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়েছে তাতে ফ্র্যাকচার হবে না।

তখন হল সম্‌কিত

নিজের দোষ দেখলে তখন থেকে সম্‌কিত হয়েছে এমন বলা যায়। নিজের দোষ দেখলে বুঝতে হবে যে জাগৃতি এসেছে। নইলে তো সব নিদ্রার

ঘোরে চলছে। দোষ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে কিনা তার চিন্তা করার দরকার নেই, মুখ্য প্রয়োজন তো জাগৃতি-র। জাগৃতি হওয়ার পর আর নতুন দোষ হয় না; আর পুরাতন দোষসমূহ আস্তে আস্তে দূর হয়। আমাদের দেখতে হবে ওই দোষগুলো কিভাবে হয়েছিল।

যত দোষ, তত প্রতিক্রমন দরকার

অনন্ত দোষে দোষী, তাই ততটাই প্রতিক্রমন করতে হবে। যত দোষ ভরে এনেছেন সব আপনি দেখতে পাবেন। 'জ্ঞানীপুরুষ' জ্ঞান দেওয়ার পর দোষ দেখা যায় নয়তো নিজের দোষ নিজে দেখা যায় না - এরই নাম অজ্ঞানতা। নিজের একটাও দোষ দেখা যায় না অথচ অন্যের দোষ অসংখ্য দেখা যায়। একেই বলে মিথ্যাদৃষ্টি।

দৃষ্টি রাখ নিজদোষের প্রতি

এই জ্ঞান নেওয়ার পর ভিতরে খারাপ চিন্তা এলে তাকে দেখবে, ভালো চিন্তা এলে তাকে-ও দেখবে। ভালো-র প্রতি রাগ (অনুরাগ) নয়, আর খারাপের প্রতি দ্বেষও নয়। ভালো-খারাপ বিচার করার আমার প্রয়োজন নেই কারণ নিজের সত্তাই নিজের বশীভূত নয়। জ্ঞানী তাহলে কি দেখেন? সমস্ত জগৎকে নির্দোষ দেখেন। কারণ এ সমস্তই নির্গত হচ্ছে গলন রূপে (ডিস্‌চার্জ) - এতে ওই বেচারার কি দোষ? আপনাকে কেউ গালি দিলে সেটা ডিস্‌চার্জ; আবার উপরওয়ালা আধিকারিক (বস্) আপনাকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলে তো সে-ও ডিস্‌চার্জ। 'বস্' তো নিমিত্ত মাত্র; জগতে কারোর কোন দোষ নেই। দোষ দেখলে সেটা নিজের-ই ভুল আর এই ভুল থেকেই জগৎ সংসারের সংরক্ষণ। দোষ দেখলে অন্যের সাথে শত্রুতা হয়ে যায়।



এড্জাস্ট এভ্রিহোয়্যার (সর্বত্র মানিয়ে চলুন)

এই কথাটি আত্মস্থ্ করুন

'এড্জাস্ট এভরিহোয়্যার'-এই কথাটি যদি আপনি নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারেন তাহলেই যথেষ্ট হবে। জীবনে শান্তি আসবে। কলিযুগের এই ভয়ানক সময়ে যদি মানিয়ে চলতে না পারেন তো শেষ হয়ে যাবেন। সংসারে যদি আর কিছু না পারেন তো চলবে কিন্তু মানিয়ে চলতে অবশ্যই জানা দরকার। সামনের জন যদি মানিয়ে চলতেই না চায় তবু আপনি যদি তার সাথে মানিয়ে চল্লেন তো ভবসাগর সাঁতরে পার হয়ে যাবেন। যে অন্যের সাথে মানিয়ে চলতে পারে তার সংসারে কোন দুঃখ থাকে না। 'এড্জাস্ট এভরিহোয়্যার'! প্রত্যেকের সাথে সমন্বয় হয়ে যায় - সেটাই সবথেকে বড় ধর্ম। এ যুগে সকলের প্রকৃতি ভিন্ন, তাই মানিয়ে চলা ছাড়া কোন উপায় আছে?

ধরুন এই আইসক্রীম, এ তো আপনাকে বলে না যে আমার থেকে দূরে থাকো; আপনার ইচ্ছে না হলে খাবেন না। কিন্তু এইসমস্ত বয়স্ক লোকেরা ওর ওপর বিরক্ত হয়ে থাকেন। এই মতভেদ যুগ পরিবর্তনের কারণে হয়। ছোটরা তো যুগের রীতি অনুসারেই চলবে।

আমি যুগের সাথে মানিয়ে চলতে বলছি। ছেলে নতুন ধরনের টুপি পরে এলে তাকে বলবে না যে 'এরকম কোথা থেকে নিয়ে এলে?' তার বদলে মানিয়ে নিয়ে বলবে 'এত সুন্দর টুপি কোথায় পেলে? কত দাম পড়ল? খুব সস্তায় পেলে?' এইভাবে মানিয়ে চলবে।

নিজের ধর্ম বলছে যে অসুবিধার মধ্যেও সুবিধা দেখো। যেমন রাতে আমার মনে হল 'এই চাদরটা ময়লা'। কিন্তু যেমনি মানিয়ে নিলাম অমনি এত মোলায়েম মনে হল যে সে আর কি বলব। আসলে পঞ্চেন্দ্রিয়জ্ঞান অসুবিধা দেখায় আর আত্মজ্ঞান সুবিধা দেখায়। সেইজন্যে আত্মা-য় থাকো। ভাল-মন্দ বললে তা নিজেকেই কষ্ট দেবে। আমাদেরকে দুটোই সমান দেখতে হবে। একটাকে 'ভাল' বলেছেন বলেই অন্যটা 'মন্দ' হয়েছে। আর তখন তা কষ্ট দেবে। কেউ সত্যি বললে তার সাথে মানিয়ে চলবে আবার কেউ মিথ্যে বললেও তার সাথে মানিয়ে চলতে হবে। কেউ যদি আমাকে বলে যে, 'আপনার কোন আক্কেল নেই' আমি সাথে সাথে তা মানিয়ে নিয়ে বলি, 'সে তো কোনদিন-ই ছিল না। তুমি একথা আজকে জানলে? আমি তো ছোটবেলা

থেকেই জানি।' এরকম বললে ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে। আর ও আমার কাছে আক্কেল খুঁজতে আসবে না।

পত্নীর সাথে মানিয়ে চলা (এড্‌জাস্টমেন্ট)

কোন কারণে যদি দেরি হয়ে যায় আর স্ত্রী রাগারাগি করে বলে, 'এত দেরি করে এলে? এরকম হলে আমার চলবে না।' আরও অনেক কিছু যদি ক্রোধবশতঃ বলে তো বলবেন, 'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। এখন চলে যেতে বললে চলে যাচ্ছি, আর যদি ভিতরে আসতে বলো তো ভিতরে এসে বসছি।' তখন সে যদি বলে, 'না, যেতে হবে না, এখানে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ো।' তাহলে আবার জিজ্ঞাসা করো, 'তুমি বললে খাই, না হলে শুয়ে পড়ি।' যদি বলে যে না, খেয়ে নাও তাহলে ওর কথা শুনে আপনার খেয়ে নেওয়া উচিৎ, অর্থাৎ মানিয়ে নেওয়া গেল। পরদিন সকালে সুন্দর চা পাবে আর যদি ধমক দাও তাহলে সকালের চা রাগের সাথে গম্ভীর মুখে দেবে। তিনদিন ধরে এটাই চলতে থাকবে।

আহারে মানিয়ে নেওয়া

ব্যবহারে সম্পূর্ণ হয়েছে তখনই বলা যাবে যখন সর্বত্র মানিয়ে চলা যাবে। এখন প্রগতির সময় এসেছে, এইজন্যে মতভেদ হতে দেবেন না। এই কারণেই আমি লোকেদের সূত্র দিয়েছি, 'এড্‌ডাস্ট এভরিহোয়্যার'-সর্বত্র মানিয়ে চলুন। কঢ়ী (এক প্রকার ব্যঞ্জন) বেশী নোনতা হয়ে গেলে মনে রাখবে দাদাজী মানিয়ে চলতে বলেছেন; অল্প হলেও খেয়ে নেবে। আচারের কথা মনে এলে কিছুটা চেয়ে নাও। কিন্তু ঝগড়া নয়, ঘরে যেন ঝগড়া না হয়। নিজে যদি কখনো ঝামেলায় পড়ে যান তো সেখানে নিজেই মানিয়ে নেবেন-তবেই সংসার সুন্দর মনে হবে।

অপছন্দ হলেও মানিয়ে নাও

মানিয়ে না চলার মানসিকতা (ডিসঅ্যাডজাস্ট) নিয়ে যারা-ই আপনার জীবনে আসবে আপনি তাদের সাথে মানিয়ে নিন (অ্যাডজাস্ট)। প্রতিদিনের জীবনে যদি শাশুড়ী - বৌমা, বড়বৌ - ছোটবৌ-এর মধ্যে ঝগড়া-অশান্তি থাকে তো এই সংসারচক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা যার আছে তাকে-ই মানিয়ে নিতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কেউ একজন সম্পর্কে ভাঙন ধরায় তাহলে অন্যজনকে তা মেরামত করতে হবে যাতে সম্পর্ক আর শান্তি দুই-ই

বজায় থাকে। এই আপেক্ষিক সত্য-তে আগ্রহ দেখানোর, জেদ করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। 'মানুষ' তাকে-ই বলা হয় যে সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলতে পারে।

বদলানোর চেষ্টা না মানিয়ে নেওয়া?

যদি আপনি সমস্ত পরিস্থিতিতে সামনের জনের সাথে মানিয়ে চলতে পারেন তো জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে। মৃত্যুর সময় সাথে কি নিয়ে যাব? কেউ হয়তো বলল, 'ভাই, আমার স্ত্রীকে সোজা করে দাও।' আরে, ওকে সোজা করতে গেলে তুমি নিজেই বেঁকে যাবে। সে চেষ্টা না করে যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও, সেটাই ঠিক। আপনাদের যদি চিরকাল একসাথে থাকতে হত তাহলেও একটা কথা ছিল; কিন্তু এই জন্মের পর দু'জনের কে কোথায় চলে যাবেন তার কোন ঠিকানা নেই। দু'জনের মৃত্যুর সময় আলাদা, কর্ম আলাদা, কিছু নেওয়ারও নেই, দেওয়ারও নেই। এখান থেকে উনি কোথায় যাবেন তার ঠিকানা কি? আপনি ওনার উন্নতির চেষ্টা করবেন আর পরের জন্মে উনি অন্য কারোর হয়ে যাবেন।

সেইজন্যে না আপনি ওকে পাল্টানোর চেষ্টা করবেন না উনি আপনাকে পাল্টানোর চেষ্টা করবেন। যা পেয়েছেন তাই সোনার মত শুদ্ধ মনে করুন। প্রকৃতি কারোর বদলানো সম্ভব নয়। কুকুরের লেজ যেমন বাঁকা তেমনি-ই থাকে। তাই আপনি নিজে সাবধান থাকুন - 'এড্জাস্ট এভরিহোয়্যার'।

অভদ্র, রূঢ়-প্রকৃতির লোকের সাথে মানিয়ে চলা

আদর্শ সাংসারিক ব্যবহার তাকেই বলে যেখানে মতভেদ নেই মানিয়ে চলা আছে। এমনকি প্রতিবেশীও বলবে 'সব ঘরে ঝগড়া হয় কিন্তু এই বাড়িতে ঝগড়া নেই।' যেখানে মানিয়ে চলতে অসুবিধা হচ্ছে সেখানেই আপনার শক্তি বাড়াতে হবে। অনুকূলতা যেখানে সেখানে তো শক্তি আছেই। প্রতিকূল লাগাটাই দুর্বলতা। আমার কেন সবার সাথে অনুকূলতা থাকে? যত মানিয়ে চলতে পারবে তত শক্তি বৃদ্ধি হবে আর দুর্বলতা হ্রাস পাবে। সঠিক বোধশক্তি তখনই আসবে যখন সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর হবে।

নরম, ভদ্রস্বভাবের লোকের সাথে তো সবাই মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যখন কোন অভদ্র, একগুঁয়ে, রূঢ়-কর্কশ লোকের সাথে মানিয়ে চলতে পারবে, সবার সাথে মানিয়ে চলতে পারবে তখনই কার্যসিদ্ধি হবে। বিরক্ত হলে, রেগে

গেলে চলবে না। সংসারের কোন কিছুই আপনার সাথে খাপ খাবে না - আপনাকেই সবকিছুর সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। তাহলেই জগৎ সুন্দর নইলে জগৎ অসুন্দর। সেইজন্যে সব জায়গায় মানিয়ে নিন।

আপনার প্রয়োজন থাকলে যদি কেউ অভদ্র, অবাধ্য-ও হয় তাহলেও তার সাথে মানিয়ে নিতে হবে। স্টেশনে আপনার কুলি-র প্রয়োজন আছে আর সে পারিশ্রমিক নিয়ে ঝামেলা করছে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে চার-আনা বেশী দিয়েও ওকে রাজী করাতে হবে নতুবা মাল-পত্র আপনাকেই বইতে হবে।

অভিযোগ? না, মানিয়ে নেওয়া (এড্জাস্ট)

বাড়িতেও মানিয়ে নিতে জানা চাই। আপনি সৎসঙ্গ থেকে দেরী করে বাড়ি ফিরলে আপনার স্ত্রী কি বলবেন? 'ঘড়ির দিকেও তো খেয়াল রাখতে হয়।' অশান্তির বদলে একটু আগে বাড়ি গেলে ক্ষতি কি? এখন আপনার এরকম ভোগান্তির কারণ কি? কারণ আপনি আগের জন্মে অন্যদের প্রতি অনেক অভিযোগ এবং দোষারোপ করেছেন - এই জন্মে তার পরিনাম এসেছে। তখন আপনার হাতে ক্ষমতা ছিল তাই শুধু অভিযোগই করে গেছেন। এখন আপনার হাতে ক্ষমতা নেই বলে অভিযোগ না করে মানিয়ে নিতে হবে। অতএব এখন যোগ-বিয়োগ করে নিন। কেউ যদি গালি-ও দিয়ে যায় তা পাওনার খাতায় জমা করে নিন; অভিযোগ করবেন না।

বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি স্থির করে যে আমরা একে অন্যের সাথে মানিয়ে চলব তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। একজন যদি জেদ করতে থাকে তো অন্যজনকে হার মানতে হবে। মানিয়ে নিতে না পারলে সবাই পাগল হয়ে যাবে। গতজন্মে সবাইকে হয়রান করেছে বলেই পাগল হয়েছে। যে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল শিখে নিয়েছে সে সংসার থেকে 'মোক্ষ'-এর দিকে ঘুরে গেছে। মানিয়ে নেওয়ার নাম-ই জ্ঞান। যে মানিয়ে নিতে শিখেছে সে কিনারায় পৌঁছে গেছে।

কেউ রাতে দেরীতে শুতে যান, আবার কারোর অভ্যাস তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া - তো এদের মধ্যে সমন্বয় কি করে হবে? এরকম ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসের লোক যদি একই পরিবারে একসাথে থাকে তো কি হবে? ঘরে কেউ একজন আপনাকে বলতে পারে 'আপনি নির্বোধ'; তখন আপনাকে ধরে নিতে হবে এর বলার ধরনই এইরকম। এইভাবেই আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। তা না করে যদি আপনি প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে যান তো সংঘাত বেড়েই যাবে আর

আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। সামনের জন আপনাকে ধাক্কা দিয়েছে বলে যদি আপনিও তাকে ধাক্কা দেন তো এটাই প্রমাণ হবে যে আপনিও অন্ধ।

আমাদের মানুষের প্রকৃতি চিনতে হবে। আপনি যদি আমাকে ধাক্কা দিতে আসেন তা হলেও আমি ধাক্কা লাগতে দেব না, সরে যাব; নয়তো দুর্ঘটনা হবে আর দু'জনেই আঘাত পাবে। কোন গাড়ির যদি দুর্ঘটনায় বাম্পার ভেঙে যায় তো ভিতরে বসে থাকা যাত্রীদের কি অবস্থা হবে? তাদের তো চরম দুর্দশা হবে। এইজন্যে প্রকৃতিকে চিনতে হবে। ঘরে প্রত্যেকেরই প্রকৃতি ভিন্ন - তা বুঝে নিতে হবে।

সংঘাত কি রোজ রোজ হয়? যখন আপনার কর্মের উদয় হয় তখনই সংঘাত হয় এটা বুঝে সেই সময় মানিয়ে চলতে হবে। ঘরে যদি স্ত্রী-র সাথে ঝগড়া-অশান্তি হয়ে যায় তাহলে তার পরে তাকে বাইরে হোটেলে খাইয়ে খুশী করুন - সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী করবেন না।

খাবার থালায় যা আসবে খেয়ে নেবেন। যা সামনে আসে তা সংযোগ। ভগবান বলেছেন যে সংযোগকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করবে সেই ধাক্কা তাকেই লাগবে। এইজন্যে অপছন্দের জিনিস-ও যদি খাবার থালায় আসে তো তার থেকে অল্প কিছু হলে-ও আমি খেয়ে নিই। যে মানিয়ে নিতে পারে না তাকে মানুষ কি করে বলা যাবে? যে সংযোগাধীন হয়ে সব কিছু মানিয়ে নেয় তার ঘরে ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট হবে না। সংযোগের লাভ নিতে গেলে মানিয়ে নিতে শিখতে হবে। ঝগড়া-অশান্তিতে কারোর কোন লাভ নেই উপরন্তু শত্রুতা বাড়ে।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে কিছু নীতি-নিয়ম থাকে; কিন্তু তবুও সংযোগানুসার কাজ করা উচিৎ। জীবনে যা সংযোগ আসে তাকেই যে মানিয়ে নিতে সক্ষম সেই মানুষ। মানিয়ে চলাটা এমন একটা অস্ত্র যে কেউ যদি জীবনের সমস্ত সংযোগে মানিয়ে চলতে পারে তো সে সহজেই মোক্ষলাভ করবে।

মনোমালিন্য (মানিয়ে চলতে অক্ষম) - এটাই মূর্খতা

আপনার কথা যদি আপনার সামনের জন মানতে না পারে তাহলে সেটা আপনারই ভুল। নিজের ভুল শুধরাতে পারলে সে-ও মানিয়ে নিতে পারবে। বীতরাগী-গণ সর্বত্র মানিয়ে চলতে বলেছেন। মানিয়ে চলতে না পারাটাই মূর্খতা। সর্বত্র মানিয়ে চলতে পারাকেই আমি ন্যায় বলি। নিজের মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়াই অন্যায়।

আজ পর্য্যন্ত আমার সাথে কারোর মনোমালিন্য হয়নি। আর এখানে চারজনের একটা পরিবারেও কেউ কারোর সাথে মানিয়ে চলতে পারে না। আপনাকে সবার সাথে মানিয়ে চলা শিখতে হবে। সেটা কি খুবই অসম্ভব? আপনাকে পর্যবেক্ষণ করে শিখতে হবে। আপনি যা মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করবেন তাই শিখবেন - এটাই জগতের নিয়ম। কেউ কিছু শেখাবে না।

যদি আপনি এই জগৎ-সংসার সম্পর্কে কম জানেন, কর্মক্ষেত্রেও আপনার জ্ঞান সীমিত হয় - তাহলেও চলবে কিন্তু কি করে জীবনে মানিয়ে চলতে হয় এটা জানা অত্যন্ত জরুরী। মানিয়ে চলতে না জানলে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে। জীবনে মানিয়ে চলে কার্যসিদ্ধি করুন।



সংঘাত এড়িয়ে চলুন

সংঘর্ষে জড়াবেন না

'কারোর সাথে সংঘাতের মধ্যে যাবেন না - চেষ্টা করুন এড়িয়ে যেতে'; আমার এই বাক্য যে আত্মস্থ করবে মোক্ষপ্রাপ্তি তার নাগালের মধ্যেই হবে। আমার একটা শব্দ-ও যদি কেউ সঠিকভাবে বুঝে তা জীবনে প্রয়োগ করে চলতে পারে তাহলেই কাজ হবে।

হ্যাঁ, আমার একটা শব্দ-ও যদি কেউ একটা পুরো দিন পালন করে চলে তাহলে তার মধ্যে প্রচন্ড শক্তি আসবে। প্রত্যেকের অন্তরে এত শক্তি আছে যে ইচ্ছে করলেই অন্যের সাথে সংঘাত এড়াতে পারে, এমনকি অপরদিক থেকে সংঘর্ষের সবরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বে-ও।

ভুল করে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবেও কারোর সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে সেই পরিস্থিতি থেকে কোনরকম শত্রুতার অবকাশ না রেখে স্থৈর্যের সাথে সমস্যার সমাধান করে বেরিয়ে আসতে হবে।

ট্রাফিক - নিয়ম দুর্ঘটনা নিবারণ করে

সমস্ত সংঘাত থেকে দুজনেরই ক্ষতি হয়। আপনি কাউকে দুঃখ দিলে সাথে সাথে আপনিও দুঃখ পাবেন। সেইজন্যে আমি এই ট্রাফিক নিয়মের উদাহরণ দিয়েছি। রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ম না মেনে চললে দুর্ঘটনায় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে - সংঘর্ষ এত বিপজ্জনক। অন্যের সাথে সংঘাতও এরকম-ই ক্ষতিকারক। সেইজন্যে কারোর সাথে সংঘাতে যাবেন না। সংসারে প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যেও কখনও সংঘাত তৈরি করবেন না। তাতে সবসময় বিপদ থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি আপনার সাথে ঝগড়া করার মানসিকতা নিয়ে এসে শব্দবোমা নিক্ষেপ করতে থাকে তো আপনাকেই সতর্ক থেকে সংঘাত এড়াতে হবে। প্রথমে না বুঝলেও আস্তে আস্তে ঝগড়ার একটা ফল আপনার উপর প্রভাব ফেলবে; আপনার মন অশান্ত হবে। তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে অন্যজন আপনার মনে প্রভাব ফেলছে সেইজন্যে আপনাকে তার রাস্তা থেকে সরে আসতে হবে। আপনার বোধশক্তি যত বাড়বে তত-ই আপনি সংঘাত এড়াতে পারবেন। সংঘাত এড়াতে পারলেই মুক্তি সম্ভব।

সংঘাত থেকেই এই জগতের উৎপত্তি। একেই ভগবান 'শত্রুতা থেকে

তৈরী’ এইরকম বলেছেন। প্রত্যেক মানুষ এমনকি প্রত্যেক জীব-ই প্রতিহিংসাপরায়ণ। যখন সংঘাত মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় তখন কেউই আপনাকে প্রতিহিংসা না নিয়ে মুক্তি দেবে না। প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মা আছেন আর প্রত্যেকের আত্মশক্তিও সমান। সংঘাতের সময় শারীরিক দুর্বলতার কারণে কোন জীব যদি সহ্য করতে বাধ্যও হয় সে ভিতরে প্রতিহিংসা পুষে রাখবে, আর পরের জন্মে তা সুদে-আসলে উসুল করে নেবে।

কেউ যদি খুব বকবক করে তাহলেও তার থেকে আমাদের সংঘাত সৃষ্টি করা উচিৎ নয়। আর আপনার কথা থেকে যদি কারোর মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত বড় দোষ।

সহ্য করবে? না, সমাধান করো

সংঘাত এড়ানো মানে সহ্য করা নয়। সহ্য কত করবে? সহ্য করা আর কোন ‘স্প্রিং’-কে দাবানো - একই ব্যাপার। চাপতে চাপতে ‘স্পিং’ অত্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করে এক সময় লাফিয়ে ওঠে আর অনেক ক্ষতি করে। সেইজন্যে সহ্য না করে সমস্যার সমাধান করতে শেখো। অজ্ঞানদশায় অবশ্য সহ্য করতেই হয়।

যদি কাউকে আপনি সহ্য করতে বাধ্য হন তো বুঝে নেবেন যে সেটা আপনারই কর্মের হিসাব। আপনি জানেন না যে কোথা থেকে এবং কেমন করে এই হিসাব এলো তাই ধরে নেন যে এটা অন্য জনেরই দোষ। আপনার কোন হিসাব নেই। কিন্তু নতুন করে আপনাকে কেউ কিছু দিচ্ছে না। আজ আপনি যা পাচ্ছেন তা আপনার পূর্বজন্মের কর্মের ফল; যা গতজন্মে দিয়েছিলেন তাই এ জন্মে ফিরে পাচ্ছেন। আপনি যা পান তা আপনার কর্মের উদয়বশতঃ পান-সামনের জন শুধু নিমিত্ত মাত্র।

সংঘাত-নিজেরই ভুল থেকে

এই জগতে যে সংঘাত হয় তা আপনারই ভুল থেকে; যার সাথে সংঘাত হচ্ছে (অর্থাৎ সামনের জন) তার কোন ভুল নেই। সামনের জন তো ধাক্কা দেবেই। ‘আপনি কেন ধাক্কা দিলেন?’ এই প্রশ্ন করলে বলবেন যে ‘সামনের জন ধাক্কা দিয়েছে - তাই।’ তাহলে বলতে হয় সেও অন্ধ আর আপনিও অন্ধ হয়ে গেছেন।

কারোর সাথে সংঘাত হলে আপনাকে ভাবতে হবে যে ‘আমি কি করেছি বা বলেছি যে কারণে এই সংঘর্ষ হল?’ নিজের ভুল দেখতে পেলে নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। নইলে যতক্ষণ আমি অন্যজনের ভুল

খুঁজতে থাকব ততক্ষন জীবনের কোন সমস্যার সমাধান হবে না। 'নিজেরই ভুল' এটা মেনে তবেই সংসারের অন্ত আসবে। সংসারের অন্ত আনার আর কোন উপায় নেই। কারোর সাথে সংঘাত হলে সেটা নিজেরই অজ্ঞানতার পরিচয়।

যদি কোন বাচ্চা পাথর মেরে আপনার রক্ত বের করে দেয় তো কি করবেন? বাচ্চার উপর রাগ করবেন। আর আপনি যাচ্ছেন-পাহাড় থেকে পাথর পড়ে আঘাত লেগে রক্ত বেরোতে থাকল। তখন কি করবেন? রাগ করবেন? না। এর কারন কি? পাথর পাহাড় থেকে পড়েছে। বাচ্চাটা হয়তো পশ্চাতাপ করেছে তার ফেলা পাথর আপনার লাগাতে কিন্তু তবুও আপনি রাগ করবেন। আর পাহাড় থেকে পাথর কে ফেললো?

বিজ্ঞানকে বোঝো

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি ঝগড়া করতে চাই না কিন্তু কেউ যদি এসে ঝগড়া শুরু করে তখন কি করবো?

দাদাশ্রী ঃ এই দেওয়ালের সাথে যদি কেউ ঝগড়া করে তো কতক্ষণ করবে? দেওয়ালের সাথে ধাক্কা লেগে মাথায় আঘাত পেলে আপনি দেওয়ালকে কি করবেন? মাথায় লেগেছে মানে আপনার দেওয়ালের সাথে সংঘাত হয়েছে - তাহলে কি দেওয়ালকে মারবেন? সেইরকমই যারা আপনার সাথে লড়াই-ঝগড়া করছে তারাও সবাই দেওয়াল। এতে তাদেরকে দোষ দেওয়ার কিছু আছে কি? আপনার সাথে যারা লড়াই-ঝগড়া করতে আসবে আপনাকেই বুঝতে হবে যে এরা দেওয়ালের মত। তখন আপনি তা এড়াতে পারবেন। তাহলে কোন সমস্যা নেই।

আপনার কি এই দেওয়ালকে বকাবকি করার ক্ষমতা আছে? তেমনি অন্যের হাতেও কোন ক্ষমতা নেই। তাই কাউকে নিমিত্ত করে যে সংঘাত আপনার জীবনে আসবে তার থেকে সরতে পারবেন না। সুতরাং চিৎকার-চেঁচামেচি করে লাভ কি? নিমিত্তকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারোর হাতে কিছু পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। সেইজন্যে আপনিও দেওয়ালের মত হয়ে যান। আপনি যদি স্ত্রীকে বকাবকি করেন তাহলে তাঁর ভিতরের ভগবান সব লক্ষ্য করেন। আর যদি স্ত্রী আপনাকে বকাবকি করেন এবং আপনি দেওয়ালের মত হয়ে যান তো আপনার ভিতরের ভগবান আপনাকে সাহায্য করবেন।

কারোর সাথে মতভেদ হওয়া আর দেওয়ালে ধাক্কা লাগা - দুই-ই সমান। এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দেখতে না পাওয়ার কারণেই দেওয়ালের সাথে ধাক্কা লাগে। তেমনি কারোর সাথে মতভেদও দেখতে না পাওয়ার কারণেই হয়। প্রথমক্ষেত্রে সে দেখতে পায় না সামনে কি আছে আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে সে আগে থেকে কোন সমাধান বার করতে পারে না তাই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ যা এই মতভেদ-এর কারণ তা কেউ দেখতে পায় না বলে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এই কথাটা বোঝা দরকার। যার লাগে তারই দোষ- দেওয়ালের দোষ নয়। দেওয়ালে ধাক্কা খেলে আপনি দেওয়ালের সাথে ঝগড়া করতে যান কি? এই সংসারের সমস্ত কিছুই দেওয়ালের মত; দেওয়ালের স্থিতিতেই আছে। এইজন্যে কে ঠিক কে ভুল বা কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল তা বোঝাতে যাওয়ার কিছু প্রয়োজন নেই।

সংঘাত - নিজের অজ্ঞানতা

সংঘাতের কারণ কি? অজ্ঞানতা। যতক্ষন কারোর সাথে মতভেদ হচ্ছে ততক্ষন সেটা আপনার দুর্বলতার প্রকাশ। মতভেদে ভুল আপনারই - অন্য লোকের নয়। অন্যের ভুল হয়ই না। যদি কেউ জেনেশুনে ইচ্ছে করেও সংঘাতে জড়াতে আসে তো ওখানে আপনাকে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে আসতে হবে, 'ভাই, এ আমি বুঝতে পারছি না' বলে। যেখানে মতভেদ হচ্ছে সেখানে ভুল আপনার।

ঘর্ষণে শক্তি-ক্ষয়

সমস্ত আত্মশক্তি যদি কোন কিছুতে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা ঘর্ষণে। একটু-ও সংঘর্ষ হলেই শেষ। কেউ ঝগড়া করতে আসলে আপনাকে সংযম রাখতে হবে। মতভেদ হওয়া কাম্য নয়। যদি শুধু সংঘাত বন্ধ হয় তাহলেই মানুষ মুক্তি পাবে। কেউ যদি এটুকুও শিখতে পারে যে 'আমি কোন সংঘাতের মধ্যে যাব না'-তাহলে তার কোন গুরু বা আর কারোর প্রয়োজন নেই। এক-দু জন্মে মুক্তি পেয়ে যাবে। 'সংঘাতের মধ্যে যাব-ই না' - এরকম যদি কারোর বোধে আসে আর সে দৃঢ় নিশ্চয় করে নেয় তাহলে তখন থেকেই তার সম্কিত (আত্মবোধের শুরু) হয়ে যাবে।

জ্ঞান-এর পরে অজ্ঞান অবস্থায় সংঘাতজনিত কারণে যে শক্তিক্ষয় হয়েছিল তা প্রথমে ফিরে আসে। কিন্তু তখন আবার নতুন করে সংঘাতে লিপ্ত হলে সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে আর তা নাহলে শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

জগতে প্রতিহিংসা থেকেই সংঘাত হয়। সংসারের মূল কারণ-ই এই প্রতিহিংসা। যার প্রতিহিংসা আর সংঘাত বন্ধ হয়ে গেছে তার মুক্তি হয়েই গেছে। শত্রুতা চলে গেলে প্রেম আসে। প্রেম মুক্তিপথের বাধা নয়।

কমন সেন্স (সাধারন বোধ) সর্বত্র প্রযোজ্য

যদি কেউ আপনার সাথে বাদ-বিবাদ করতে চায় কিন্তু আপনি তার সাথে বিবাদে লিপ্ত না হন তাহলে আপনার মধ্যে 'কমন সেন্স'-এর উন্মেষ হবে। কিন্তু সংঘাতে জড়ালে 'কমন সেন্স' চলে যায়। আপনার দিক থেকে কোনরকম সংঘর্ষ থাকা উচিৎ নয়। অন্যের দিক থেকে সংঘাত এলে আপনার মধ্যে 'কমন সেন্স' উৎপন্ন হবে। আত্মার এই শক্তি এমনই যে সংঘাতের সময় কি ভাবে কাজ করতে হবে তার সমস্ত উপায় দেখিয়ে দেয় আর একবার এই শক্তি বিকশিত হলে তা আর ছেড়ে যায় না। অন্যদিক থেকে যত সংঘাত আপনার উপর আসবে তত 'কমন সেন্স' বাড়বে।

এই দেওয়ালের জন্যে যদি আপনার মনে কোন নকারাত্মক (নেগেটিভ) বিচার আসে তাহলে সেটা অতটা ক্ষতিকারক নয় কারণ ক্ষতিটা একদিকে হবে। কিন্তু কোন জীবের প্রতি নকারাত্মক বিচার এলে সেটা খুবই বিপজ্জনক। দু'দিকেই তা ক্ষতি করবে। কিন্তু আপনি যদি এর প্রতিক্রমণ করেন তাহলে সমস্ত দোষ ধুয়ে যাবে। সেইজন্যে যেখানে যেখানে সংঘাত হচ্ছে সেখানে প্রতিক্রমন করলে তা শেষ হয়ে যাবে।

যে সংঘাতে লিপ্ত হয় না তার তিন জন্মে মুক্তি হবে - এর গ্যারান্টী আমি (দাদাশ্রী) দিচ্ছি। বাদ-বিবাদ হয়ে গেলে প্রতিক্রমন করে নেবেন। যতক্ষন বিষয়-বিকার আছে, আত্মীয়-বন্ধু আছে ততক্ষন সংঘাতও থাকবে। সংঘাতের মূল কারণ-ই এই। যে বিষয়-বিকারকে জিতেছে তাকে কিছু হারাতে পারবে না। তার প্রভাব সবার উপরে পড়বে।



যা ঘটেছে তা ন্যায়

প্রকৃতিতে সবসময় ন্যায় হয়

যা প্রকৃতির ন্যায় তাতে একমুহূর্তের জন্যেও অন্যায় হয়নি। প্রকৃতিতে একপলের জন্যেও কখনো অন্যায় হয় না। কোর্টে অন্যায় হতে পারে কিন্তু প্রকৃতিতে নয়।

'যা ঘটেছে তাই ন্যায়' - প্রকৃতির এই নিয়মকে বুঝতে পারলে আপনি জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন কিন্তু ক্ষণিকের জন্যেও যদি প্রকৃতিকে অন্যায্য মনে করেন তাহলে তা জগতে আপনার সমস্যার কারণ হবে। প্রকৃতিকে ন্যায়ী বুঝতে পারাই জ্ঞান। সমস্ত কিছুর স্বরূপকে বুঝতে পারা-ই জ্ঞান আর এই স্বরূপকে চিনতে না পারাটা-ই অজ্ঞান।

জগতে ন্যায় খুঁজতে গিয়েই তো সমস্ত দুনিয়ায় যুদ্ধ হয়েছে। জগৎ ন্যায়-স্বরূপ। তাই জগতে ন্যায় খুঁজতে যেও না। যা ঘটছে তাই ন্যায়; যা ঘটে গেছে তা-ও ন্যায়। জগতের লোকে ন্যায় পেতে আইন-আদালত তৈরী করেছে কিন্তু সেখানে ন্যায়বিচার পাবে এটা ভাবা তাদের বোকামি। তার বদলে কি ঘটছে তার দ্রষ্টা হও - সেটাই ন্যায়। লোকসংজ্ঞার ন্যায় আর প্রকৃতির ন্যায় পৃথক। ন্যায় আর অন্যায় - দু'টোই পূর্বজন্মের কর্মফল। তার পরিবর্তে নিজেদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ন্যায় খুঁজতে গিয়ে লোকে আদালতের দ্বারস্থ হয় আর নিজেদেরকে নিঃশেষ করে ফেলে।

যদি আপনি কাউকে অপমান করেন আর সে আপনাকে তার বদলে বহুবার অপমান করে তো আপনার সেটা অন্যায় মনে হবে। কিন্তু আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আপনার পূর্বজন্মের কর্মফলের হিসাব অনুযায়ী সে আপনাকে অপমান করেছে অর্থাৎ আপনার হিসাব পুরো করেছে। প্রকৃতির নিয়ম কি? আপনার পুরানো হিসাব সব একসাথে করে মিটিয়ে দেয়। যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে উত্যক্ত করছেন তাহলে সেটাও প্রকৃতির ন্যায়। স্ত্রী মনে করছেন স্বামী খারাপ আর স্বামী মনে করছেন স্ত্রী খারাপ। কিন্তু এও প্রকৃতির ন্যায়-ই। কারোর টাকা খোয়া গেলে সেটা তার এজন্মের কষ্টার্জিত টাকা হতে পারে কিন্তু তার নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের হিসাব বাকি আছে। পূর্বজন্মের হিসাব না থাকলে কেউ কারো থেকে কিছু নিতে পারে এমন শক্তি-ই কারোর নেই। এমন কেউ এ পৃথিবীতে জন্মায় নি যে পূর্বজন্মের হিসাব ছাড়া কোন লেনা-দেনা করতে পারে। প্রকৃতি এমনই নির্ভুল নিয়ামক।

পরিনাম থেকে কারণ বোঝা যায়

এই সমস্ত কিছুই ফল। পরীক্ষায় যদি অঙ্কে ১০০-র মধ্যে কেউ ৯৫ পায় আর ইংরেজিতে ১০০-র মধ্যে ২৫ পায় তাহলে সে কোথায় ভুল করেছে বুঝতে পারবে নাকি? এই পরিনাম থেকে তার কি ভুল হয়েছে তা তো সে বুঝবে। সমস্ত সংযোগ যা একত্র হয় তা সমস্ত-ই ফল। এই ফল থেকে কারন কি ছিল তা আমি বুঝতে পারি।

রাস্তার ধারে একটা কাঁটা খাড়া হয়ে আছে। সেই রাস্তা দিয়ে তো অনেক লোকের যাতায়াত কিন্তু কাঁটা অমনিই আছে। আপনি সচরাচর জুতো-চপ্পল ছাড়া রাস্তায় বেরোন না। কিন্তু সেদিন হঠাৎ 'চোর চোর' রব ওঠাতে আপনিতাড়াহুড়ো করে খালি পায়েই রাস্তায় বেরোলেন কি হয়েছে দেখতে আর তখনই যদি কাঁটাটা আপনার পায়ে ফুটে যায় তো সেটা আপনার হিসাব।

কেউ দুঃখ দিলে জমা করবেন। যা আপনি আগে কাউকে দিয়েছিলেন তাই আপনার কাছে ফিরে এলে জমা করবেন। কেননা কোন কারণ ছাড়া কেউ কাউকে দুঃখ দিতে পারে প্রকৃতিতে এরকম নিয়ম-ই নেই। সমস্ত কাজের পিছনেই কারণ থাকে। সেইজন্যে জমা করবেন।

ভগবানের কাছে কেমন হয়?

ভগবান ন্যায়স্বরূপ-ও নন আবার অন্যায়স্বরূপ-ও নন। কোন জীবের বিন্দুমাত্রও দুঃখ না হয় - এটাই ভগবানের ভাষা। ন্যায়-অন্যায় শব্দগুলো শুধুমাত্র মানুষের ভাষাতেই আছে।

চোর চুরি করাকে ধর্ম বলে জানে, দানী দান করাকে ধর্ম মনে করে। কিন্তু এসব-ই লোকসংজ্ঞা, ভগবানের ভাষা নয়। ভগবানের কাছে তো পয়সা-কড়ি কিছু নেই। ভগবানের জগতে এই আছে যে, 'কোন জীব অন্য কোন জীবকে বিন্দুমাত্র দুঃখ দেবে না; এই আমার আজ্ঞা।'

নিজের মধ্যের দোষ-ই অন্যের দোষ দেখায়

কেবলমাত্র নিজের দোষের জন্য লোকে জগতে অন্যায় দেখে। প্রকৃতিতে তো একমুহূর্তের জন্যেও অন্যায় হয় নি। শুধুমাত্র ন্যায়-ই হয়। কোর্ট-এর দেওয়া রায়-এ ন্যায় নাও পাওয়া যেতে পারে - সেখানে অন্যায় হতে পারে কিন্তু প্রকৃতির বিচারে তো কখনো বিন্দুমাত্রও অন্যায় হয় না।

প্রকৃতিতে অন্যায় হলে কেউ মুক্তি পেত না। লোকে বলে তাহলে ভাল লোকের মুস্কিলে ভরা জীবন - এরকম কেন হয়? কিন্তু কেউ কাউকে মুস্কিলে ফেলতে পারে না। যে আজ মুস্কিলে পড়েছে সে অতি অবশ্যই পূর্বজন্মে কাউকে মুস্কিলে ফেলেছিল - সেইজন্যে এইসব তার জীবনে আসছে। কেউ নিজে যদি অন্যের জীবনে নাক না গলায় তো তার জীবনেও কারোর নাক গলানোর ক্ষমতা নেই।

জগৎ ন্যায়স্বরূপ

এই জগৎ স্বপ্ন নয়। সমগ্র জগৎ ন্যায়স্বরূপ। প্রকৃতি কখনও একবিন্দু অন্যায় করে নি। কেউ দুর্ঘটনায় আহত হচ্ছে, কেউ মারা যাচ্ছে - এসবই প্রকৃতির ন্যায়বিচার। প্রকৃতি কখনো ন্যায়ের বাইরে কিছু করেই নি। এটা আমাদেরই না বোঝার ফল যে যা খুশী বলে দিই। জীবনযাপনের কলা আমাদের জানা নেই। তাই সারাক্ষণ-ই চিন্তা। এইজন্যে যা ঘটছে তাকে ন্যায় বলুন।

'যা ঘটেছে তা ন্যায়' বলে বুঝলে সংসার-সমুদ্র পার হয়ে যাবেন। এই জগতে এক মুহূর্তের জন্যেও অন্যায় হয় না - ন্যায়ই ঘটছে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিই মানুষকে জালে জড়ায় আর সে ভাবে একে কি করে ন্যায় বলা যায়? এই আমি মূল কথাটা বোঝাতে চাই - প্রকৃতির ন্যায়কে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবেন না; বুদ্ধিকে আলাদা রাখুন। বুদ্ধি সবসময় মানুষকে জালে জড়িয়ে ফেলে। একবার একথাটা বুঝে নেওয়ার পর বুদ্ধির কথা শুনবেন না। যা ঘটেছে তাই ন্যায়। মানুষের কোর্টে ভুল-ত্রুটি হতে পারে, রায়ে সোজা-উল্টো হতে পারে কিন্তু প্রকৃতির কোর্টে কোন অন্যায় কখনও হয় না।

ন্যায় খুঁজে খুঁজে তো পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন। মানুষ ভাবে যে আমি তো এর কোন ক্ষতি করি নি কিন্তু এ কেন আমার ক্ষতি করছে? ন্যায় খুঁজতে গিয়েই তো এরা এত মার খাচ্ছে। সেইজন্যে ন্যায় খুঁজবেন না। ন্যায়ের খোঁজে তো মার খেয়ে খেয়ে ক্ষত-তে জীবন ভরে গেছে; আর এরপরেও তো ফল একই থাকে। তাহলে প্রথম থেকেই এটা বুঝে নিয়ে মেনে নেন না কেন? এগুলো আর কিছুই নয়, শুধু অহঙ্কারের দখলদারি।

বিকল্প-এর অন্ত, মোক্ষমার্গের সূচনা

বুদ্ধি যখনই বিকল্প দেখাবে তখন তাকে বলতে হবে যে যা ঘটেছে তাই ন্যায়। কেউ আপনার চেয়ে ছোট হয়েও মর্যাদা দেয় না - তখন বুদ্ধি ন্যায়

খুঁজতে চেষ্টা করবে। ও যদি মর্যাদা দেয় - সেটাও ন্যায় আর না দিলেও ন্যায়। বুদ্ধির ব্যবহার যত কম হবে তত আপনি নির্বিকল্প হবেন।

ন্যায় খুঁজতে গেলে বিকল্প বাড়তেই থাকবে আর প্রকৃতির ন্যায় বিকল্প থেকে নির্বিকল্প করে। যা ঘটে গেছে তাই ন্যায়। যদি সালিশী সভার রায় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যায় এবং সে সেটা অমান্য করে তাহলে তার ভোগান্তি বাড়তেই থাকবে। সে যদি আর কারোর কথা না শুনে ন্যায়-এর খোঁজে ঘুরে বেড়াতে থাকে তাহলে তার সমস্যার জালেই সে জড়িয়ে যাবে আর শেষ অবধি কিছুই পাবে না শুধু দুঃখ-কষ্ট ছাড়া। এর বদলে প্রথম থেকে মেনে নেওয়া উচিৎ যে যা ঘটেছে তাই ন্যায়। প্রকৃতি নিরন্তর ন্যায়-ই করে চলেছে। সবসময় সে ন্যায়-ই করে কিন্তু তার প্রমান সে দিতে পারে না। প্রমান তো 'জ্ঞানী' দেন যে কিভাবে এটা ন্যায়। 'জ্ঞানী' যখন কাউকে দৃঢ় প্রত্যয় করিয়ে দেন যে কেমন করে এটা ন্যায় তখনই সে নির্বিকল্প হয়ে যায় আর মুক্ত হয়।



যে কষ্ট পাচ্ছে ভুল তার

প্রকৃতির ন্যায়ালয়ে ...

এই জগতে তো অনেক ন্যায়াধীশ আছেন কিন্তু কর্মের জগতে প্রকৃতিই একমাত্র বিচারক এবং বিচারের বাণী - 'যে কষ্ট পাচ্ছে তার ভুল'। একমাত্র এই ন্যায় দ্বারাই সমগ্র ব্রহ্মান্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর ভ্রান্তির ন্যায় থেকেই সমস্ত সংসার চলছে।

প্রকৃতির নিয়ম সর্বক্ষণ জগতকে পরিচালনা করছে। যারা পুরস্কারের যোগ্য তাদের পুরস্কার দেয় আর যারা শাস্তির যোগ্য তাদের শাস্তি দেয়। প্রকৃতিতে নিয়ম বহির্ভূত কোন কাজ হয় না। প্রকৃতির নিয়ম সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য কিন্তু মানুষ সেটা বুঝতে পারে না বলে মানতে পারে না। যখন কারোর মধ্যে শুদ্ধ বোধের উদয় হবে তখনই সে প্রকৃতির ন্যায়কে গ্রহণ করতে পারবে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বার্থ দৃষ্টি থাকবে ততক্ষণ প্রকৃতির ন্যায় বুঝতে পারবে না।

আপনি কেন কষ্ট পাচ্ছেন?

আপনাকে কেন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে এটা খুঁজে বার করুন না। আমরা নিজেদের ভুলেই নিজেরা বাঁধা পড়েছি - কেউ আমাদের বাঁধেনি। এই ভ্রান্তি চলে গেলেই আমরা মুক্ত। বাস্তবে আমরা মুক্ত-ই কিন্তু ভ্রান্তির কারণে বন্ধনে আবদ্ধ।

জগতের আসল স্বরূপ, বাস্তবিকতা সম্পর্কে তো লোকের কোন জ্ঞান নেই। যে জ্ঞানের কারণে সংসারে ঘুরে মরতে হয় সেই অ-জ্ঞান, সাংসারিক জ্ঞান-ই শুধু আছে। পকেটমার আপনার পকেট কেটে টাকা নিয়ে গেলে কি ভুল করে? আপনার-ই পকেট কাটল অন্য কারোর কেন কাটল না? দু'জনের মধ্যে কে কষ্ট পাচ্ছে, পকেটমার না আপনি? যে কষ্ট পাচ্ছে ভুল তার-ই।

দুঃখ - কষ্ট নিজের ভুলের কারণে

যে দুঃখ পায় সে তার ভুলের শাস্তি পায়, যে সুখ পায় সে পুরস্কার পায়। লৌকিক নিয়ম নিমিত্তকেই দোষী বলে ধরে। ভগবানের নিয়মে যার ভুল তাকেই ধরে আর সেটাই আসল কানুন। এই নিয়ম কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, এটা একদম সঠিক। জগতে এমন কোন নিয়ম নেই যা কাউকে অকারণে দুঃখ-সুখ দিতে পারে। নিজের কোন দোষ থাকলে তবেই তো লোকে বলবে। জগতে কোন জীব অন্য জীবকে কষ্ট দিতে পারে না - প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র।

কেউ কষ্ট পেলে সেটা পূর্বে কাউকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম। নিজে দোষমুক্ত হয়ে যান তাহলে কারোর সাথে কোন হিসাব থাকবে না।

জগৎ দুঃখ ভোগের নয়, সুখ ভোগের জন্য। যার যেমন হিসাব সে তেমনি পায়। কেউ জীবনে শুধু সুখ পায় আর কেউ শুধু দুঃখ - এটা কেমন করে হয়? কারণ নিজেই এরকম হিসাব নিয়ে এসেছে। যে দুঃখ পায় সে নিজের দোষে পায়। যে দুঃখ দেয় দোষ তার নয়। সংসারী মনে করে যে দুঃখ দিচ্ছে ভুল তারই কিন্তু ভগবানের বিচারে যে দুঃখ পাচ্ছে তারই ভুল, যে দুঃখ দিচ্ছে তার নয়।

নিজের ভুলের পরিনাম

যখন আমাকে কোনরকম কষ্ট পেতে হয় তা আমারই ভুলের পরিনাম। নিজের ভুল ছাড়া কষ্ট ভোগ করতে হয় না। এই জগতে এমন কেউ নেই যে আমাকে বিন্দুমাত্রও দুঃখ দিতে পারে। কেউ যদি দুঃখ দেয় সেটা নিজেরই ভুলের পরিনাম। যে দুঃখ দিচ্ছে সে দোষী নয় - সে তো নিমিত্তমাত্র। যে কষ্ট পাচ্ছে ভুল তারই।

স্বামী-স্ত্রী খুব ঝগড়া করে যখন ঘুমাতে যাবে তখন যদি দেখো স্ত্রী গভীর ঘুমে আর স্বামী জেগে বারবার এপাশ-ওপাশ করছে তাহলে বুঝতে হবে ভুলটা স্বামীর - কারণ স্ত্রী তো কোন কিছু ভোগ করছে না, সে তো আরামে ঘুমাচ্ছে। আর যদি স্বামী গভীর ঘুমে চলে যায় অথচ স্ত্রী জেগে থাকে তাহলে বুঝবে ভুল তারই। 'যে কষ্ট পাচ্ছে তার ভুল'। কিন্তু জগৎ নিমিত্তকেই মারতে যায়।

ভগবানের কানুন কি?

ভগবানের কানুন বলে যে কোন ক্ষেত্রে, কোন কালে যে কষ্ট পাচ্ছে সেই দোষী। কারোর হয়তো পকেটমারা হয়েছে, তো পকেটমারের জন্যে সেটা আনন্দের সময়, সে তো হোটেলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করছে আর ঠিক সেই সময় যার পকেট কাটা গেছে সে কপাল চাপড়াচ্ছে। যে ভুগছে ভুল তারই। আগে হয়তো সে কখনো চুরি করেছিল তাই তার পকেটমার হয়েছে। আবার পকেটমার যখন ধরা পড়বে তখন লোকে তাকে চোর বলবে।

সমস্ত জগৎ কষ্ট যে দিয়েছে সেই নিমিত্তকে দোষী দেখে। কষ্ট পাচ্ছে নিজে অথচ দোষী করছে নিমিত্তকে। এতে তো নিজের ভুল দ্বিগুন হয়ে যায় আর সমস্যাও বেড়ে যায়। এই কথাটা বুঝলে সমস্যা কমবে।

জগতের নিয়ম এই যে যা চোখে দেখা যায় তাকে ভুল ভাবে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হল যে কষ্ট পাচ্ছে ভুল তারই।

কাউকে বিন্দুমাত্র দুঃখ যদি কেউ না দেয় আর কারোর কাছ থেকে দুঃখ পেলে সেটা জমা করে নেয় (কোন দোষারোপ না করে মেনে নেয়) তাহলে তার সেই খাতার হিসাব পুরো হয়ে যাবে। কাউকে নতুন করে কিছু না দেওয়া, নতুন ব্যবসা শুরু না করা আর যা পুরানো আছে তা মিটিয়ে ফেলার অর্থ হিসাব পুরো করা।

উপকারী, কর্ম থেকে যে মুক্তি দেওয়ায়

জগতে কারোর কোন দোষ নেই; দোষ যারা খুঁজে বের করে তাদেরই দোষ। জগতে দোষী কেউ নয়। সবকিছুই নিজ নিজ কর্মের উদয় থেকে হয়। যে কষ্ট পাচ্ছে সে এই জন্মের কোন দোষের শাস্তি পাচ্ছে না; পূর্বজন্মের কর্মের ফলস্বরূপ সব কিছু ঘটছে। আজকে পশ্চাতাপ হলেও তাতে কিছু লাভ নেই কারণ একবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। সম্পূর্ণ ভোগ করে শেষ করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই।

শাশুড়ী বৌ-এর সাথে ঝগড়া করছে তবুও বৌ ভাল আছে আর শাশুড়ী কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে যে ভুল শাশুড়ীর। ভাদ্রবৌ-এর সাথে ঝগড়া করে ছোটবৌ যদি কষ্ট পাচ্ছে তো বুঝতে হবে ছোট বৌয়েরই ভুল। আর ভাদ্রবৌ যদি কোন ঝগড়া-অশান্তি ছাড়াই ছোটবৌকে দুঃখ দেয় তো বুঝতে হবে আগের জন্মের হিসেব যা দু'জনের বাকি ছিল তা এজন্মে পুরো করলো। এ জগতে হিসাব না থাকলে কারোর সাথে কারোর চোখাচোখি পর্য্যন্ত হবে না তো আর সব কিছু বিনা হিসাবে কি করে হবে? আপনি যত কিছু যত জনকে দিয়েছেন তার সমস্তই ফেরৎ পাবেন - তখন খুশী হয়ে জমা করে নেবেন আর জানবেন এবার হিসাব পুরো হল। কিন্তু জমা করতে ভুল করলে আবার কষ্ট পেতে হবে।

নিজের ভুলেরই দন্ড আসে। যে পাথর ফেলেছে তার ভুল নয় - যার লেগেছে ভুল তারই। আপনার আশেপাশের বাচ্চাদের দুষ্টুমির প্রভাব যদি আপনার উপর না পড়ে, আপনি যদি কষ্ট না পান তবে আপনার কোন ভুল নেই। আর যদি ওদের কাজের জন্যে আপনি কষ্ট পান তাহলে সেটা আপনারই ভুল - এটা নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন।

বিশ্লেষণ তো করো

ভুল কার খুঁজতে গেলে দেখো কে ভুগছে? চাকরের হাত থেকে দশটা গ্লাস পড়ে ভেঙে গেলে তার প্রভাব তো ঘরের লোকের উপর পড়বেই। এখন বাচ্চাদের উপর এর কিছু প্রভাব হবে না কিন্তু তাদের বাবা-মা আপশোষ করতে থাকবে। তার মধ্যেও আবার মা কিছুক্ষন পরে আরামে শুয়ে পড়বে কিন্তু বাবা চিন্তা করতে থাকবে - পঞ্চাশ টাকার লোকসান হয়ে গেল। বেশী সতর্ক বলে বাবার ভোগান্তি বেশি। 'যে ভুগছে তারই ভুল' - আপনি যদি সমস্ত পরিস্থিতিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করেন তাহলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে এবং মুক্তি পাবেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ কিছু লোক এমন আছে যাদের সাথে ভাল ব্যবহার করলেও তারা তা বোঝে না।

দাদাশ্রী ঃ এটা নিজেরই ভুল যে তারা বুঝতে পারে না। যারা অন্যের দোষ দেখে তারা ভুল করে। নিজের ভুলের জন্যেই কেউ নিমিত্ত হয়ে আসে। নিমিত্ত যদি জীব হয় তো তাকে দোষী মনে করো কিন্তু কাঁটা ফুটে যদি কষ্ট পাও তো কি করবে? রাস্তার চৌমাথায় কাঁটা পড়ে আছে, হাজার লোক সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে; কারোর পায়ে বিঁধল না কিন্তু তোমার পায়ে বিঁধল। 'ব্যবস্থিত শক্তি' কিরকম? যার পায়ে কাঁটা ফোটার তার পায়েই ফুটবে। 'ব্যবস্থিত শক্তি'-ই সমস্ত সংযোগ একত্র করবে-এতে নিমিত্তের কি দোষ?

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে আমি নিজের ভুল কি করে খুঁজব? তো আমি তাকে বলি যে যেখানে যেখানে আপনাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে সেখানেই ভুল হয়েছে। নিশ্চয়ই আপনার কোন ভুল হয়েছে তাই কষ্ট পাচ্ছেন - সেগুলোই খুঁজে বার করুন।

মূল ভুল কোথায়?

ভুল কার? যে ভুগছে তার। কি ভুল? 'আমি চন্দুভাই' - এই মান্যতাই আপনার ভুল। প্রকৃতপক্ষে এই জগতে সবাই নির্দোষ কাজেই কাউকে দোষী করা সম্ভব নয়। এটাই বাস্তবিক সত্য।

যে দুঃখ দিচ্ছে সে তো নিমিত্তমাত্র - দোষ তো নিজের-ই। যে উপকার করে সেও নিমিত্তমাত্র আর যে ক্ষতি করে সেও নিমিত্তমাত্র। লাভ - লোকসান নিজেরই হিসাব - সেইজন্যে এরকম হয়।



নিজদোষ দর্শনের সাধন - প্রতিক্রমণ

ক্রমণ-অতিক্রমণ-প্রতিক্রমণ

সংসারে যা কিছু হচ্ছে তা ক্রমণ। যতক্ষণ সহজ স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে ততক্ষণ ক্রমণ কিন্তু বেশি হলে তা অতিক্রমণ (অর্থাৎ মন-বচন-কায়া দিয়ে কোন জীবকে আঘাত দেওয়া)। যার প্রতি অতিক্রমণ হয়েছে তার থেকে যদি মুক্ত হতে হয় তো প্রতিক্রমণ করতে হবে মানে ধুতে হবে - তবেই পরিষ্কার হবে। পূর্বজন্মে যদি ভাব করে থাকেন যে 'অমুক লোক-কে চার ঘুষি মারতে হবে' তাহলে তা যখন এ জন্মে কাজে পরিণত হবে সেটা হল অতিক্রমণ। তখন তার প্রতিক্রমণ করতে হবে। যার প্রতি অতিক্রমণ হয়েছে তার ভিতরে থাকা শুদ্ধাত্মা-কে স্মরণ করে, তাঁকে সাক্ষী রেখে প্রতিক্রমণ করতে হবে।

কোন খারাপ ব্যবহার হলে তাকে অতিক্রমণ হলে, কোন খারাপ চিন্তা এলে তাকে দাগ বলে - তা মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। তা ধোওয়ার জন্যেও প্রতিক্রমণ জরুরী। প্রতিক্রমণ করলে আপনার প্রতি অন্যের (যার প্রতিক্রমণ করা হচ্ছে তার) ভাবও বদলে যাবে। নিজের ভাব তো ভাল হবেই - অন্যের ভাবও ভাল হবে। প্রতিক্রমন-এ এত শক্তি আছে যে বাঘও কুকুরের মত ব্যবহার করবে। প্রতিক্রমণ কখন কাজে আসবে? যখন কোন বিপরীত পরিনাম আসে তখন-ই প্রতিক্রমণ কাজে আসে।

প্রতিক্রমণ - যথার্থভাবে বোঝা

প্রতিক্রমণ কি? কেউ যদি আমাকে অপমান করে তো আমার চিন্তা করা উচিৎ এই অপমানের জন্যে দোষী কে? যে অপমান করছে সে দোষী না যাকে অপমান করছে সেই দোষী - এটা আগে ঠিক করতে হবে। যে অপমান করছে সে বিন্দুমাত্র দোষী নয় - সে নিমিত্তমাত্র। নিজের কর্মের উদয় হলে তখন এরকম নিমিত্ত পাওয়া যায়। মানে এটা নিজেরই কর্মের ফল। যে অপমান করেছে তার প্রতি যদি মনে নকারাত্মক বিচার আসে যে এর এরকমই স্বভাব, এর কাজ-ই সবাইকে অপমান করা ইত্যাদি তো তাহলে প্রতিক্রমণ করতে হবে, যদি কেউ গালাগালি করে তাহলেও সেটা যাকে গালি দিয়েছে তার-ই

হিসাব। লোকে তো যে গালি দিয়েছে তাকেই দোষী বলে আর সেইজন্যেই এত ঝগড়া।

সারাদিন যতজনের সাথে যত ব্যবহার আপনার হয়েছে তার মধ্যে যদি কারোর সাথে ব্যবহার উল্টো (খারাপ) হয়ে যায় তাহলে কি আপনি সেটা বুঝতে পারবেন না? আমরা যে সাধারন ব্যবহার করি সেটা ক্রমণ। ক্রমণ মানে সাংসারিক ব্যবহার। কিন্তু যদি কারোর সাথে কর্কশ ব্যবহার করেন বা কারোর প্রতি কোন অন্যায় করেন, কারোর ক্ষতি করেন তাহলে সেটা তো বোঝা যায় নাকি যায় না? এইরকম ব্যবহারকে অতিক্রমণ বলে।

অতিক্রমণ মানে উল্টো রাস্তায় চলা। যতটা উল্টো চলা হয়েছে ততটাই সোজা ফিরলে তাকে বলে প্রতিক্রমণ।

প্রতিক্রমণ-এর যথার্থ বিধি

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রতিক্রমণ-এ কি করতে হবে?

দাদাশ্রী ঃ মন-বচন-কায়া, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম, চন্দুলাল (***এই জায়গায় যার প্রতি অতিক্রমণ হয়েছে তার নাম বলবেন) এবং চন্দুলাল-এর নাম-এর সর্বমায়া থেকে ভিন্ন এমন এঁর শুদ্ধাত্মাকে মনে করে বলবেন 'হে শুদ্ধাত্মা ভগবান! আমি রূঢ়ভাবে কথা বলেছি, এটা ভুল হয়ে গেছে এইজন্যে ক্ষমা চাইছি, এই ভুল আর হবে না এরকম নিশ্চয় করছি, এই ভুল আর না হয় আমাকে এমন শক্তি দিন'। 'শুদ্ধাত্মাকে'-কে বা দাদাকে মনে করে বলুন 'এটা ভুল হয়ে গেছে'-একে বলে আলোচনা; এই ভুলকে ধোয়া মানে প্রতিক্রমণ আর 'এরকম ভুল আর কখনও হবে না' এই নিশ্চয় করা-এটা প্রত্যাখ্যান। কারোর কোন ক্ষতি করলে বা কাউকে দুঃখ দিলে যেসব অতিক্রমণ তার সাথে সাথেই আলোচনা, প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখ্যান করতে হবে।



প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবান-এর সাক্ষীতে, দেহধারী (যার প্রতি দোষ হয়েছে তার নাম)-র মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম, দ্রব্যকর্ম, নোকর্ম থেকে পৃথক এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান আপনার সাক্ষীতে আজকের দিন পর্য্যন্ত আমি যে যে ***দোষ করেছি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি; মন থেকে অত্যন্ত অনুশোচনা করছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এমন দোষ আর নাহয় এরকম দৃঢ় নিশ্চয় করছি, এর জন্যে আমাকে পরম শক্তি দিন।

***ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, বিষয়-বিকার, কপট প্রভৃতির দ্বারা কাউকে কোনরকম দুঃখ দেওয়া হলে সেইসব দোষসমূহকে মনে করতে হবে।

এইভাবে প্রতিক্রমণ করলে জীবন-ও ভালভাবে কাটবে আর মোক্ষপ্রাপ্তিও হতে পারে। ভগবান বলেছেন যে 'অতিক্রমণ-এর প্রতিক্রমণ করলে তবেই মোক্ষ-এ যেতে পারবে।'

ত্রিমন্দির নির্মাণের প্রয়োজন

যখন কোন মূলপুরুষ যেমন শ্রী মহাবীর ভগবান, শ্রী কৃষ্ণভগবান, শ্রী রামচন্দ্রজী ভগবান সশরীরে বর্তমান থাকেন তখন তাঁরা ধর্মসম্বন্ধীয় মত-মতান্তর থেকে বের করে লোকেদের আত্মধর্মে স্থির করেন। কালক্রমে এঁদের অনুপস্থিতিতে আস্তে আস্তে মতভেদের কারণে ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং পরিনামস্বরূপ সংসারে সুখ-শান্তি ক্রমশঃ লোপ পায়।

অক্রমবিজ্ঞানী পরমপূজনীয় শ্রী দাদাভগবান লোকেদের আত্মধর্ম তো প্রাপ্তি করিয়েছেন তার সাথে ধর্মের 'তুই-তুই, আমি-আমি' ঝগড়া দূর করার আর সংকীর্ণ ধার্মিক পক্ষপাতিত্বের দুরাগ্রহের বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্যে এক অদ্ভুত ক্রান্তিকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন সম্পূর্ণ নিষ্পক্ষপাতী ধর্মসংকুল-এর নির্মাণ করে।

মোক্ষ-এর ধ্যেয়-এর পূর্ণাহুতির জন্য শ্রী মহাবীরস্বামী ভগবান জগতকে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ দেখিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণভগবান গীতা-য় অর্জুনকে উপদেশরূপে 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' - এই দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। জীব আর শিব-এর ভেদ চলে গেলে আমরা নিজেরাই শিবস্বরূপ হয়ে 'চিদানন্দরূপং শিবোহং শিবোহং' দশা প্রাপ্ত করি। সমস্ত ধর্মের মূলপুরুষের অন্তরে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির কথাই ছিল। এই কথা যে বুঝবে তার পুরুষার্থ এখান থেকেই শুরু হয় আর জীবমাত্রকে আত্মদৃষ্টিতে দেখলে অভেদতা উৎপন্ন হয়। কোন ধর্মের খন্ডন-মন্ডন না হয়, কোন ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র আঘাত না পৌঁছায় এইরকম ভাবনা নিরন্তর থাকে।

পরম পূজনীয় দাদাভগবান (দাদাশ্রী) বলতেন যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কারোর কোনরকম বিরাধনা (অসম্মান) হয়ে গেলে তাঁর বা তাঁদের আরাধনা করলে সমস্ত বিরাধনা ধুয়ে যায়। এইরকম নিষ্পক্ষপাতী ত্রিমন্দির সঙ্কুলে প্রবেশ করে সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তির সামনে যখন নতমস্তক হওয়া যায় তখন ভিতরের সমস্ত জেদ, দুরাগ্রহ, ভেদভাবে ভরা সমস্তরকম মান্যতা নষ্ট হতে

শুরু করে আর নিরাগ্রহী করে তোলে।

দাদাভগবান পরিবারের মুখ্য কেন্দ্র ত্রিমন্দির আদালজ-এ অবস্থিত। এছাড়া গুজরাত-এর আমেদাবাদ, রাজকোট, ভাদরণ, চলামলী, বাসণা, ভুজ, গোধরা প্রভৃতি স্থানে নিষ্পক্ষপাতী ত্রিমন্দিরের নির্মাণ হয়েছে। মুম্বই আর মোরবীতে ত্রিমন্দিরের নির্মানকার্য চলছে।

জ্ঞানবিধি কি ?

জ্ঞানবিধিতে ভেদজ্ঞানের প্রয়োগ করা হয় যা প্রশ্নোত্তরী সৎসঙ্গ থেকে আলাদা। ১৯৫৮তে পরমপূজ্য দাদাভগবানের ভিতর যে আত্মজ্ঞান প্রকট হয়েছিল সেই জ্ঞান আজও ওনার কৃপাতে এবং পূজ্য নীরু মা-র আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞান কেন নেওয়া প্রয়োজন ?

জন্ম-মরণের চক্র থেকে থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

নিজের আত্মা জাগৃত করার জন্য।

পারিবারিক সম্বন্ধ আর কাজ-কর্মে সুখ-শান্তি অনুভব করার জন্য।

জ্ঞানবিধিতে কি পাওয়া যায় ?

আত্মজাগৃতি উৎপন্ন হয়।

সঠিক বোধের দ্বারা জীবন-ব্যবহার সম্পূর্ণ করার চাবি পাওয়া যায়।

অনন্তকালের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

অজ্ঞান মান্যতা দূর হয়।

জ্ঞান-এর জাগৃতি-তে থাকলে নতুন কর্ম-বন্ধন হয় না আর পুরানো কর্ম ফল দিয়ে শেষ হতে থাকে।

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য কি নিজে আসা জরুরী ?

আত্মজ্ঞান জ্ঞানীর কৃপা আর আশীর্বাদের ফল। এর জন্য অবশ্যই নিজে আসা প্রয়োজন।

পূজ্য নীরু মা এবং পূজ্য দীপকভাইয়ের টি.ভি. অথবা ভি.সি.ডি সৎসঙ্গ কার্যক্রম এবং দাদাজীর বইপত্র জ্ঞানের পটভূমি তৈরী করতে পারে কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার করাতে পারে না।

অন্য সব উপায়ে শান্তি অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন বইতে আঁকা প্রদীপের ছবি থেকে আলো পাওয়া যায় না, তার জন্যে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ

দরকার, তেমনি আত্মা জাগৃত করার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হয়।

জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য ধর্ম বা গুরু পরিবর্তন করতে হয় না।

জ্ঞান অমূল্য, তাই জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য কোনরকম মূল্য দিতে হয় না।



দাদাভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত
হিন্দী পুস্তক

১	জ্ঞানীপুরুষের পরিচয়	২৩	দান
২	সকল দুঃখ থেকে মুক্তি	২৪	মানব ধর্ম
৩	কর্মের সিদ্ধান্ত	২৫	সেবা-পরোপকার
৪	আত্মবোধ	২৬	মৃত্যুর সময়ে, পূর্বে ও পরে
৫	আমি কে?	২৭	নিজ দোষ দর্শণে...নির্দোষ
৬	বর্তমান তীর্থংকর শ্রী সীমঙ্কর স্বামী	২৮	পতি-পত্নীর দিব্য ব্যবহার
৭	যে ভুগছে, তার ভুল	২৯	ক্লেশ রহিত জীবন
৮	অ্যাডজাস্ট এভরিহোয়্যার	৩০	গুরু-শিষ্য
৯	সংঘাত পরিহার	৩১	অহিংসা
১০	যা ঘটেছে তা ন্যায়	৩২	সত্য-অসত্যের রহস্য
১১	চিন্তা	৩৩	চমৎকার
১২	ক্রোধ	৩৪	পাপ পূর্ণ্য
১৩	প্রতিক্রমণ	৩৫	বাণী, ব্যবহারে...
১৪	দাদাভগবান কে?	৩৬	কর্মের বিজ্ঞান
১৫	অর্থের সদ্-ব্যবহারে	৩৭	আপ্তবাণী-১
১৬	অন্তঃকরণের স্বরূপ	৩৮	আপ্তবাণী-২
১৭	জগতের কর্ত্তা কে?	৩৯	আপ্ত বাণী-৩
১৮	ত্রিমন্ধ	৪০	আপ্তবাণী-৪
১৯	ভাবনা শোধরায় জন্ম জন্মান্তর	৪১	আপ্তবাণী-৫
২০	মাতা-পিতা ও সন্তানের ব্যাবহার	৪২	আপ্তবাণী-৬
২১	প্রেম	৪৩	আপ্তবাণী-৮
২২	বোধ দ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য্য	৪৪	বোধ দ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য্য (পূর্বার্ধ - উত্তরার্ধ)

- দাদাভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও কিছু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org থেকেও আপনি ঐ সকল পুস্তক প্রাপ্ত করতে পারেন।
- দাদাভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রতি মাসে হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরেজী ভাষাতে "দাদা বাণী" ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান

দাদাভগবান পরিবার

অডালজ ঃ ত্রিমন্দির সংকুল, মীমঞ্জর সিটি, অহমদাবাদ-কল্লোল হাইওয়ে, পোষ্ট - অডালজ,, জিঃ গান্ধীনগর, গুজরাত-382421

ফোন ঃ (079) 39830100,
E-mail : info@dadabhagwan.org

রাজকোট ঃ ত্রিমন্দির, আহমদাবাদ - রাজকোট হাইওয়ে; তরঘড়িয়া চোকড়ী (সর্কল), পোষ্ট ঃ মালিয়াসণ, জিঃ রাজকোট, ফোন ঃ 9274111393

ভূজ ঃ ত্রিমন্দির, হিল গার্ডেনের পিছনে, এয়ার পোর্ট রোড। ফোন ঃ (02832) 290123

মোরবী ঃ ত্রিমন্দির, মোরবী-নওলখী হাইওয়ে, পোষ্ট ঃ জেপুর, তা-মোরবী. জিঃ রাজকোট। ফোন ঃ (০২৮২২) ২৭৯০৭৯

সুরেন্দ্রনগরঃ ত্রিমন্দির, সুরেন্দ্রনগর - রাজকোট হাইওয়ে, লোকবিদ্যালয়-এর নিকে, মুলী রোড, ফোন ঃ (02822) 297097

গোধরা ঃ ত্রিমন্দির, ভামৈয়া গ্যাঁও, এফ সিত্যাই গোডাউনের সামনে, গোধরা। জিঃ পঞ্চমহাল। ফোন ঃ (02672) 262300

অহমদাবাদ ঃ দাদাদর্শণ, ৫ মসতপার্ক সোসাইটী, নবগুজরাত কলেজের পিছনে ওস্মানপুরা, অহমদাবাদ- ফোন ঃ (079) 27540408

বড়োদরা ঃ দাদা মন্দির, ১৭, মামাকিপোল-মুহল্লা. রাওপুবা পুলিশ ষ্টেশনের সামনে, সলাটবাড়া, বড়োদরা। ফোন ঃ 992434335

মুম্বাই ঃ 9323528901, দিল্লী ঃ 9810098564

কোলকাতা ঃ 98300093230, চেন্নাই ঃ 9380159957

জয়পুর ঃ 9351408285, ভূপাল ঃ 9425024405

ইন্দোর ঃ 98935 45351, জব্বলপুর ঃ 9425160428

রায়পুর ঃ 9329523737, ভিলাই ঃ 9827481336

পাটনা ঃ 9431015601, অমরাবতী ঃ 9422915064

বেঙ্গালুরু ঃ 9590979099, হায়দ্রাবাদ ঃ 9989877786

পুণা ঃ 9422660497, জলন্ধর ঃ 9814063043

U.S.A. : Dada Bhagwan Vignan Institute
100, S W Redbud Lane, Topeka, Kanas 66606
Tel. : +1 877-505-DADA (3232),
E-mail : info@us.dadabhagwan.org
U.K. : +4433011 DADA (3232), UAE : +971557316937
Kenya : +254 722 722063 / Singapur : +65 81129229
Australia : +61421127947 / New Zealand : +64 210376434
Website : www.dadabhagwan.org



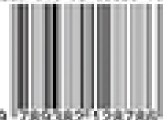
জ্ঞানবিধি

অনন্ত জন্ম থেকে নিজের স্বরূপের আত্মস্বরূপের অনুভূতির জন্য পিপাসার্ত মুমুক্ষুদের কাছে জ্ঞানী পুরুষ পরম পূজ্য দাদা ভগবানের অক্রম বিজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মসাক্ষাৎকার পাওয়ার এক অমূল্য উপহার। জ্ঞানবিধি জ্ঞানী পুরুষের বিশেষ আধ্যাত্মিক সিদ্ধির দ্বারা "আমি" (আত্মা) - এবং "আমার" (মন-বচন-কায়া)-র মধ্যে ভেদরেখা টানার জ্ঞান প্রয়োগ। এই আত্মজ্ঞান থেকে শাশ্বত আনন্দের প্রাপ্তি হয় তথা চিন্তা থেকে মুক্তি শুরু হয় এবং ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান প্রাপ্তি হতে থাকে।

\- দাদাশ্রী।



dadabhagwan.org



Printed in India

Price ₹10